ধর্ম্মের

তিনটি পথ।

ওঁ

ডাক্তার

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

ও প্রকাশিত।

[পাইগাছি, পোঃ দিগড়া, হুগলী]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত

১৩৫৪

মূল্য ৵০ আনা।

বাণীপ্রেস ;
৬৩ নং নিমতলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জে, এন, দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২৩।

উৎসর্গ পত্র।

অশেষ-গুণালঙ্কৃত—

রায় শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর

সহৃদয় করকমলেষু···

আপনি পূর্ণমাত্রায় প্রথম পথাবলম্বী—কর্ম্মী ; কর্ম্ম যে আপনাকে জ্ঞানী ও ভক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহা নিশ্চয়। তাই আজ তিনটি পথের কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া পুস্তকখানি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম ; ইতি।—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আজকাল অনেকেই ধর্ম্মের প্রকৃতভাব ও গুপ্তবিষয় সকলের ভাবার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারিয়া ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ায়, কেহ কেহ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন; আবার কেহ বা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিপথে উপনীত হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া সুগম পথ প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য; ইহা নূতন না হইলেও অনেকের পক্ষে নূতন বলিয়া মনে হইবে। যদি এই সামান্য পুস্তকে কথঞ্চিৎ ভাব প্রকাশ করিতে পারিয়া থাকি, যদি পাঠক মহাশয়দের কিছুমাত্রও ধর্ম্মে মতি আসে, তবে সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ধর্ম্মের
তিনটি পথ।

অনাদি কাল হইতে জগতে মানবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া আসিতেছে; এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইবে না। জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা মানবমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেই, জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন; কেহই অস্বীকার করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু।" জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়; আমরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃত্যু অবধারিত, ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু জানি না, কখন, কোন্ বয়সে, কোন্ সময়ে এই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

অধিকাংশ মানব এই ধ্রুব বিষয় হইতে চক্ষু ফিরাইয়া রাখে, কিন্তু যখন মৃত্যু বলপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পরম প্রিয়জনকে লইয়া যায়, তখন সে আর চক্ষু ফিরাইয়া রাখিতে পারে না; তখন তাহার জীবনে একটা বৈরাগ্যের ছায়া আসিয়া পড়ে; কিন্তু এই বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। এই বৈরাগ্য বাহ্যপদার্থ হইতে উৎপন্ন,—আত্মার প্রতি স্বভাব-

সিদ্ধ-প্রকৃতিগত-অন্তর্নিহিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইতে উৎপন্ন নহে; কাজেই, ইহা বিষয়-সৌন্দর্য্যের অভাবে ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ হইয়া যায়; এই বৈরাগ্যকে লোকে শ্মশান-বৈরাগ্য বলিয়া থাকে। ঐ শ্মশান বা ক্ষীণ বৈরাগ্য যতক্ষণ বা যতদিন বিষয়-সৌন্দর্য্যের অভাবে একেবারে নিবিয়া না যায়, ততক্ষণ বা ততদিন মানবের অন্তর্নিহিত গভীর মহৎতত্ত্ব সকলের কথঞ্চিৎ (যতটুকু পারা যায়) শিক্ষা করিয়া লওয়া উচিত ও কর্ত্তব্য।

এই সময় কাহারও কাহারও মনে মৃত্যুর বিষয়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? মৃত্যু কি? মৃত্যুর পরপারে কি আছে? মৃত্যুর পর আমার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি না? যদি থাকে, তবে কি থাকিবে? কোথায় থাকিবে এবং কি অবস্থায় থাকিবে? পার্থিব লোকের কথা চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে কি না? স্মরণ হইবে কি না? আত্মীয়দের দেখিতে পাইব কি না? তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারিব কি না? পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে পারে কি না? যদি হয়, কোন্ সময়, কি অবস্থায় হইবে? পরলোকে সহায়হীন থাকিব, কি কোন সাহায্য পাইব? জীবিত ব্যক্তির সহিত মৃত-ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় কি না? যদি হয়, কোন্ সময়? জীবিত ব্যক্তি মৃতের কোন উপকার করিতে পারে কি না? আবার মৃত ব্যক্তি জীবিতের কোন উপকার করিতে পারে কি না? পৃথিবীতে এমন কেহ দূরদর্শী আছেন কি না, যিনি ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পারেন। মৃতব্যক্তি কোন্ শক্তি দ্বারা কিরূপে আবার এই জগতে আসিয়া থাকে? "জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর

জন্ম" এই যে চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন, ইহার হাত হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায়, তবে তাহার উপায় কি? এই মহৎ উপায় বলিয়া দিতে পারেন, এমন লোক পৃথিবীতে আছেন কি না? যদি থাকেন, তবে কোথায় আছেন?

আমরা ঈশ্বরের শক্তি বা তাঁহার অতি ক্ষীণ কণামাত্র অর্থাৎ তাঁহার সেই অসীম চৈতন্যশক্তি হইতে উৎপন্ন। যদি তাঁহার অংশই হই, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি; আবার তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইব; তাঁহার অংশ বা কণা যতক্ষণ তাঁহাতে না যাইবে, ততক্ষণ গত্যন্তর নাই। সূর্য্য যেমন নিজ রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, এবং সমস্ত উত্তাপটুকু যথাসময়ে সূর্য্যতেই ফিরিয়া যায়; তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আবার তাঁহাতেই মিলিতে হইবে। যতদিন বা যতকাল মিশিতে না পাইব বা না পারিব, ততদিন বা ততকাল জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য। মৃত্যু আর কিছুই নহে, স্থূলদেহের ধ্বংসমাত্র। যখন দেহ 'আমার' বলিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে, তখন দেহ হইতে যে আমি একটা পৃথক পদার্থ, ইহা ত সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু অনুভব করিতে হইলে, উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন।

এই সাধনা কি এবং তাহার উপায় কি, জানিতে পারিলেই আমাদের যথেষ্ট মঙ্গল হইয়া থাকে।

শ্রুতির বাক্য এই যে, জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্ম যেমন সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ ও নিত্য—শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত-স্বভাব; জীবও তেমনি সৎ, চিৎ, আনন্দময় ও নিত্য—শুদ্ধ—

বদ্ধ—মুক্ত—স্বভাব; কিন্তু মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, আপনি আপনাকে ভুলিয়া, নিজে আনন্দের আকর হইয়াও সামান্য সাংসারিক-ভ্রম-আনন্দ-বিন্দুর ইচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াই।

নিতান্ত নীচ পশু হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সুখী হইতে চাহে; সকলেই সুখ খুঁজে; কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়ায়। কেহ অর্থ লইয়া, কেহ বিষয় লইয়া, কেহ স্ত্রী লইয়া, কেহ পুত্র লইয়া, কেহ ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাধীন থাকিয়া, তাহাদের সেবা করিয়া, সুখী হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সেই সমুদয় অনিত্য বস্তুতে সুখ না পাইয়া বলে, “আমার ভ্রম হইয়াছে”; তখন সুখের প্রকৃত স্থান কোথায়, এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কেহ কখন সুখ চাহি না বলিয়া পশ্চাৎপদ হয় না; কারণ সুখের অন্বেষণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও একমাত্র অবলম্বন। সুখী হইবার ইচ্ছা ঈশ্বর-প্রদত্ত; ঈশ্বরই আমাদের সুখের জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা জীবমাত্রেরই অসাধ্য, কিম্বা কেবল ইচ্ছা বলিয়া নহে—মানবের আত্মার অন্তর্নিহিত-প্রকৃতিগত-স্বভাব।

যেমন জল মাত্রেরই প্রকৃতিগত স্বভাব সমুদ্রে মিশিবার গুণ-বিশিষ্ট; যেমন প্রত্যেক ঘটস্থ, পটস্থ, গৃহস্থ আকাশ অনন্ত আকাশে মিশিবার গুণ বা স্বভাববিশিষ্ট; তদ্রূপ আমাদের আত্মাও সেই সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় মিশিবার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত-গুণবিশিষ্ট।

মাতার কোল পাইবার জন্য ক্রন্দনশীল শিশুকে যদি অন্য কোন স্ত্রীলোক কোলে করে, তবে প্রথমে তাহাকে মাতা মনে

করিয়া শান্ত হয় বটে, কিন্তু যখন সে নিজের মাতা নহে বলিয়া চিনিতে পারে, তখন আবার দ্বিগুণ কাঁদিতে থাকে; যতক্ষণ নিজের মাতাকে না পায়, ততক্ষণ তাহার ক্রন্দনও থামে না; তদ্রূপ আমাদের আত্মা যতক্ষণ বা যতদিন সেই সগুণবিশিষ্ট পরমাত্মাকে না পায়, ততক্ষণ বা ততদিন অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হয় না ও প্রকৃত সুখী হইতেও পারে না।

এই সুখের অনুসন্ধান হইতে আমরা ঈশ্বরকে পাইব, ঈশ্বরে যাইব বা তৎসদৃশ হইব; ইহাই শেষ ফল; যেমন একটী বীজ মাটিতে পুঁতিলে অঙ্কুরিত হয়, গাছ হয়, মুকুলিত হয়, ফুল হয়, আবার ফল হয়,—সেই ফলই ঈশ্বর। তখন আর আমার আমিত্ব থাকিবে না, আমি তিনি হইয়া যাইব; তখন ক্ষুদ্র কূপের জল বৃহৎ সমুদ্র-জলে মিশিয়া যাইবে; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ডে লীন হইবে; ইহাই শেষ ফল।

মৃত্যু কি, বলিতে হইলে দেহের বিষয় একটু আলোচনা কর্ত্তব্য। আমরা যে দেহ দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন আরও কতকগুলি দেহ আমাদের আছে; যাহা দেখিতে পাই, তাহাকে অন্নময় কোষ কহে। ইহা অন্নাদি দ্বারা অর্থাৎ স্থূল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে নির্ম্মিত; এইটিই আমাদের স্থূল শরীর। আমরা যে মৃত্যু দেখিতে পাই, তাহা এই অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহের ধ্বংস মাত্র। কোষ অর্থে আবরণ; এই স্থূল দেহের অভ্যন্তরে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ আছে; ইহাকে সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গশরীর কহে। ইহা সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। ঐ মনোময় কোষ দুই ভাগে বিভক্ত; নিম্নাংশ—বাসনা বা কামনা দেহ, আর উচ্চাংশ—ভাবনা দেহ; ইহার মধ্যে আরও একটি

শরীর আছে, তাহার নাম আনন্দময় কোষ; ইহাকে কারণ শরীর কহে। নিম্নে ইহার তালিকা দিলাম।

অন্নময় কোষ ...	ভাণ্ডদেহ পিণ্ডদেহ	স্থূলশরীর।
প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ	বাসনাদেহ ভাবনাদেহ	সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর।
আনন্দময় কোষ		কারণ শরীর।

উপর্য্যুক্ত ভাণ্ডদেহ পঞ্চভূতের স্থূল উপাদানে নির্ম্মিত, তাই উহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহের অবিকল অনুরূপ এই পিণ্ডদেহ স্থূল আকাশ বা ইথারে (Ether) নির্ম্মিত।

প্রাণময় কোষে দশ ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ, মন আর বুদ্ধি এই সতেরটি সংযুক্ত।

পরাবিদ্যাসমিতি উক্ত পঞ্চ কোষকে বোধসৌকর্য্যার্থে সাত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

১। বডি (Body)	স্থূল শরীর বা ভাণ্ড-দেহ
২। এষ্ট্রাল্ বডি (Astral Body)	পিণ্ডদেহ বা ছায়া-দেহ; ইহার অন্য নাম সূক্ষ্মদেহ বা কাম-দেহ।
৩। ভাইট্যালিটী (Vitality)	প্রাণ বা জীবনী-শক্তি
৪। এনিম্যাল্ সোল্ (Animal Soul)	কামনা-দেহ বা বাসনা-দেহ

৫। হিউম্যান্ সোল্ (Human Soul)	বহির্ম্মুখীন মন অন্তর্ম্মুখীন মন	মন, কাম বা মানস-দেহ।
৬। স্পিরিচুয়েল্ সোল্ (Spiritual Soul)	বুদ্ধি।	
৭। স্পিরিট (Spirit)	আত্মা।	

বহির্ম্মুখীন মনকে অহঙ্কার কহে; আর অন্তর্ম্মুখীন মন ঐ বহির্ম্মুখীন মনের বা অহঙ্কারের একটি রশ্মি মাত্র; এই অন্তর্ম্মুখীন মনই ধীশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি, এই অন্তর্ম্মুখীন মন কামনা বা বাসনার সহিত মিলিত হইলেই বহির্ম্মুখীন মন নামে কথিত বা অভিহিত হইয়া থাকে। এই কাম মনসঃই মনের একটী অংশ মাত্র। ইহাই জীবনের কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রস্বরূপ, ইহাই মানস বা ভাবনা-দেহ নামে কথিত হয়।

স্থূল বা ভাণ্ড-দেহ।

প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে নিরন্তর এই স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে, শরীরের কোন অংশ ধ্বংস হইতেছে, আবার কোন অংশ পুনঃ গঠিত হইতেছে। এই সংস্কার জন্য অবিরাম নূতন নূতন উপাদান সংযুক্ত হইয়া স্থূলদেহের পুষ্টি-সাধন করিতেছে। আমাদের এই স্থূল দৃশ্য দেহ অসংখ্য জীবসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ আমাদের এই স্থূলদেহ জীবাণু দ্বারা গঠিত। প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল আমাদের দেহ ত্যাগ

করিতেছে ও জন্মিতেছে, ঐ সকল জীব মানবের জীবদ্দশায় সুশিক্ষিতের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া, যেন নায়কের আদেশক্রমে দেহ-গঠনকার্য্য সুনিয়মে সুসম্পন্ন করে; কিন্তু মানবের মৃত্যু-কালে সেই সকল জীব বিশৃঙ্খল হইয়া ঐ গঠনকে ভাঙ্গিয়া ফেলে; যেন মাঝী-হারা হইয়া পরস্পর নানা উৎপাত ঘটাইয়া বসে; তখন আপনারাই আপনাদের ধ্বংসের হেতু হইয়া দেহের ক্রিয়া নষ্ট ও বন্ধ করিয়া বসে। মরণকালে দেহী দেহত্যাগ করিয়া গেলে পর, সেই পরিত্যক্ত দেহে অসংখ্য জীবাণু সকল তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করে।

জীবিতাবস্থায় প্রাণ পিণ্ডদেহের সাহায্যে ঐ জীবাণুদের নিয়মিত করিয়া রাখে, পরে প্রাণ চলিয়া গেলে, তাহারা আর সুনিয়মে থাকে না; কাজেই পরস্পর মারামারি কাটাকাটী করিয়া মরে। এই কথাটি মনে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংসের কথা মনে পড়ে। আমার বোধ হয়, রূপক রূপে ইহা উহারই অনুরূপ মাত্র। দেহীরূপী শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, দেহরূপ (জীবসমষ্টি) যদুবংশ ঐরূপ আপনারা মারামারি কাটাকাটী করিয়া মরে; তখন ঐ জীবাণু বা অণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই যে জীবাণু একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছিল, সেই বন্ধনের বিচ্ছেদের নামই মৃত্যু। জীবনীশক্তির বলে জীবাণুর একত্র সমাবেশ অর্থাৎ পৃথক পৃথক অণুগুলি একত্র বদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট-আকার-বিশিষ্ট হইলেই মানুষ হইল; আবার যখন ঐ জীবনীশক্তির লোপ হয়, তখনই ঐ অণু সকল এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ-শক্তির বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকের আকাশে ছড়াইয়া পড়ে; এই বিক্ষিপ্তাবস্থা বা ছড়ান অবস্থার নামই মৃত্যু।

পিণ্ডদেহ।

স্থূলদেহের মধ্যে পিণ্ডদেহ বা সূক্ষ্মদেহ পরিব্যাপ্ত বা ছড়ান ভাবে থাকে, এবং ভাণ্ড বা স্থূলদেহের বাহিরেও কতকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে; ইহাকেই পিণ্ডদেহ কহে। এইটি সূক্ষ্মদেহেব নিম্নস্তর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত স্থূল। মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই এই দেহটি শবরূপে পড়িয়া যায়। এই পিণ্ডদেহ পূর্ব্বলিখিত ভাণ্ডদেহের পরিচালক; ইহাই ভাণ্ডদেহ বা স্থূলদেহের নিয়ন্তা অর্থাৎ পিণ্ড-দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ স্থূল বা ভাণ্ডদেহের কার্য্য চালনা করিয়া থাকে; সুতরাং পিণ্ডদেহ স্থূলদেহের বাহনস্বরূপ। মৃত্যুব পব এই পিণ্ডদেহ কিছুক্ষণ স্থূলদেহের সঙ্গে থাকে, পবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কাজেই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ হইতে পৃথক হইলে ভাণ্ডদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে।

তখন পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহের সংযোজক যে রূপার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম সূত্র ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া যায়; ইহাকেই মৃত্যু কহে। নিদ্রিতাবস্থায় এই সূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয় না। যতক্ষণ এই ভাণ্ডদেহ হইতে পিণ্ডদেহ একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ স্থূলদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা উচিত নহে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে মৃত্যুর পরও কয়েক ঘণ্টা দাহ করিতে নিষেধ আছে। নিদ্রা ও মৃত্যুতে এইমাত্র প্রভেদ।

এই পিণ্ডদেহ যে কেবল মানুষেরই আছে, তাহা নহে। প্রত্যেক চেতন অচেতন পদার্থেরই অপতত্ত্বে নির্ম্মিত ঠিক স্থূল দেহের অনুরূপ পিণ্ডদেহ আছে।

আবার ঐ সকল অচেতন পদার্থের পিণ্ডদেহ বিশেষ বিশেষ

অপতত্ত্বে নির্ম্মিত। কাচের ঐ পিণ্ডদেহ কঠিন অপতত্ত্বে; জলের পিণ্ডদেহ তরল অপতত্ত্বে; বাষ্পের ঐ পিণ্ডদেহ বাষ্পীয় অপতত্ত্বে নির্ম্মিত হয়; সুতরাং মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, গৃহের সমস্ত দ্রব্যেরই ঐ সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তির মনে হয়, ঐ সকল বস্তুর স্থূল দেহই দেখিতেছি, বাস্তবিক স্থূলদেহ দেখিতে পায় না; সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায়। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির স্থূলদেহ থাকায়, মৃত-ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ বা অন্য কোন বস্তুর সূক্ষ্ম দেহ দেখার শক্তি থাকে না; কারণ জীবিত ব্যক্তি স্থূল-ভাবাপন্ন; আর মৃতব্যক্তির সে স্থূল অবস্থা নাই। স্থূলভাবে সূক্ষ্মভাব দর্শনের শক্তি থাকে না; কারণ ইন্দ্রিয় সকল স্থূল ক্ষিতিতত্ত্বে নির্ম্মিত, আর সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম অপতত্ত্বে নির্ম্মিত। সূক্ষ্মভাবে স্থূলও দেখিতে পায় না।

যখন পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ হইতে জন্মের মত পৃথক হইতে থাকে, তখন সেই মৃত ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ ও শোক করিলে উহার দারুণ যন্ত্রণা হইতে থাকে; তৎকালে মৃত ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশার কৃত-কর্ম্ম সকল বাজীকরের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় পর পর দেখিতে পায়, তখন সেই সকল কর্ম্মের হিসাব-নিকাশ হইতে থাকে; সুতরাং নিজ কৃত সামান্য সামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত সে তখন দেখিতে পায়; তখন আত্মীয়েরা আর্ত্তনাদ করিলে তাহার সেই সকল কৃত-কর্ম্মের হিসাব-নিকাশের গোল-যোগ হইয়া যায়। তৎকালীন ঐ সকল চিন্তার সমষ্টি একত্রিত হইয়া পরজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং তৎকালে আর্ত্তনাদ করিয়া গোল করিলে তাহার পরজীবন গঠনের উপায় সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অতএব মুমূর্ষুকালে তাহার নিকট আর্ত্ত-

নাদ করিয়া তাহার পর জীবনকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেওয়া কথনই বুদ্ধিমান আত্মীয়ের উচিত নহে। যিনি আর্ত্তনাদ করেন, তিনি তাহার প্রকৃত আত্মীয় নহেন, বরং শত্রু। তৎকালে স্থির ও ধীরভাবে ঈশ্বরের নাম শুনান প্রকৃত আত্মীয়ের কর্ত্তব্য।

অন্নময় কোষ খসিয়া গেলে পিণ্ডদেহ, সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ বাসনাদেহ ও ভাবনা-দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান বা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এই বাসনা-দেহ মনোময় কোষের স্থূলাংশ দ্বারা ও ভাবনা-দেহ মনোময় কোষের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা নির্ম্মিত। নিদ্রাভঙ্গের পর ইহ-জগতের পরিবর্ত্তে সে আর একটি জগৎ দেখিতে পায়; তাহাকে ভুবর্লোক কহে; ইহাকে সচরাচর প্রেতলোক বা কামলোক কহিয়া থাকে। প্রেত অর্থে ইহ-জগৎ হইতে প্রস্থিত ব্যক্তির গমনের স্থান; আর যেখানে ইহ-জীবনের কামনা বা বাসনা সকল প্রবল আকার ধারণ করিয়া যাতনা দিতে থাকে, তাহাই কাম-লোক; ইহাকে সাধারণে নরকও কহিয়া থাকে।

নিদ্রাভঙ্গের পর মৃতব্যক্তি প্রথম প্রথম বুঝিতেই পারে না যে, সে মরিয়াছে কি জীবিত আছে; কারণ সে পৃথিবীস্থ আত্মীয় বন্ধু ও গৃহের দ্রব্যাদি সবই দেখিতে পায়। যদিও সেই সকলের সূক্ষ্মদেহ দেখে, কিন্তু সূক্ষ্ম কি স্থূল দেখিতেছে বুঝিতে পারে না, কারণ সূক্ষ্মদেহ স্থূলের ঠিক অনুরূপ; তবে সে দেখে যে, সে নিজে প্রাচীর আদি ভেদ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছে; আত্মীয় বন্ধু তাহার কথা শুনে না; শুনিতে পায় না বা গ্রাহ্য করে না; তাহাকে দেখিতে পায় না; এবং নিজে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতানুভব করে; অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত

হয় না; শরীর নীরোগ, সুস্থ, সবল; এমন সুস্থতা সে জীবনে কখন অনুভব করে নাই; আবার কখন বা আত্মীয়েরা কথা কহে ও তাহার কথা শুনে। (ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, যখন জীবিতেরা নিদ্রিত হয়, তখনই দেখিতে পায় ও কথা কহিতে পারে, কিন্তু জাগিলেই আর তাহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কথা শুনিতে পায় না, সুতরাং কথাও কহে না)।

যখন মৃত-ব্যক্তির বিশ্বাস হয় যে, সে মরিয়াছে, তখন নিজের পাপ সকল মনে করিয়া নরকের ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। এই সময় মহাত্মাগণ দয়া করিয়া সান্ত্বনা দান করেন। তাঁহারা কহেন,—"ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার নাই; নিজ পাপ অপেক্ষা বেশী সাজা কখনই পাইবে না; নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ হইলেই অতি সুখে ও আনন্দে থাকিবে ভয় নাই।"

তৎপরে ঐ কামলোকে বা প্রেতলোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী বাসনা বা কামনার অজস্র দারুণ যাতনা সকল ভোগ হয়; তজ্জন্য ইহাকে কামময় লোক কহে। ভুবর্লোকের নিম্নাংশ বা স্থূলাংশই প্রেতলোক, আর উচ্চাংশ বা সূক্ষ্মাংশকে পিতৃলোক কহিয়া থাকে। প্রেতলোকে উপস্থিত ব্যক্তির স্থূলদেহ থাকে না বটে, অথচ মনের বৃত্তিগুলি স্পষ্ট বা পরিষ্কার থাকে, বুদ্ধিব কোন পরিবর্ত্তন হয় না; ভূর্লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন ছিল, এখানেও ঠিক তেমনি থাকে; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রবৃত্তিগুলি প্রবল আকার ধারণ করিয়া ভীষণ যাতনা দিতে থাকে।

সূক্ষ্মদেহ বা বাসনাদেহ ও ভাবনাদেহ।

অপতত্ত্বের নিম্ন স্তরে পিণ্ডদেহ নির্ম্মিত; ইহা অপেক্ষা অপ-তত্ত্বের উচ্চ স্তরে সূক্ষ্ম দেহটি প্রস্তুত। এই দেহটি অবলম্বন করিয়া প্রাণজীব নিদ্রাকালে বা মৃত্যুর পর ভুবর্লোকে ভ্রমণ করে। ইহাতে কামনা সকল বদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে কামদেহ বা বাসনাদেহ কহে। এই দেহটি লইয়া মানুষ কামলোকে অর্থাৎ ভুবর্লোকে কামনা সকল ভোগ করে। ইহার অভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, তাহা তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত সুতরাং এই দেহটি বাসনাদেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত; ইহার নাম ভাবনা বা মানসদেহ। ভুবর্লোক ভোগ শেষ হইলে এই বাসনা বা কামদেহটি খসিয়া যায়; ইহাকেই দ্বিতীয়বার মৃত্যু কহে; তখন মানস বা ভাবনাদেহ লইয়া স্বর্লোকে বা স্বর্গে গমন করে।

জীবিতাবস্থায় মানবের কামদেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরমাণু সকল মিশান থাকে কিন্তু মৃত্যুর পর কামদেহের স্থূল পরমাণু-গুলি উপরে, আর সূক্ষ্মগুলি ক্রমে ক্রমে নিম্নে স্তরে স্তরে সাজান হয়; যাহাদের বাহিরের আবরণ যত স্থূল, তাহারা ততই কাম-লোকের নিম্নস্তরে থাকে; আর যাঁহাদের বাহিরের আবরণ যত সূক্ষ্ম, তাঁহারা ততই ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন সুতরাং কাম, ক্রোধ আদি কুচিন্তা দ্বারা যে যতই নিজের কামদেহের স্থূল পরমাণু সকল বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাকে ততই পরলোকের নিম্নস্তরে যাইতে হইবে; কাজেই কষ্ট পাওয়া তাহার পক্ষে অনিবার্য্য, আর ঐ কুচিন্তা যে যতই আসক্তি সহ করিয়াছে, ততই বেশীদিন সেই নিম্নস্তরে থাকিয়া দারুণ কষ্ট পাইতে হইবে।

পরে যখনই ঐ স্পন্দন থামিয়া যাইবে, তখনি কামদেহের মৃত্যু হইবে অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়া গিয়া উর্দ্ধস্তরে উন্নীত হইবে। এইরূপে বহু বিলম্বে উর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিবে; কিন্তু যাঁহাদের সৎচিন্তা দ্বারা সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি অধিক এবং স্থূল পরমাণুগুলি নিস্পন্দ বা ক্রিয়াহীন, তাঁহারা অতি শীঘ্রই উর্দ্ধে উঠিতে পারেন। ভুবর্ল্লোকের স্তরে স্তরে সকলকেই উঠিতে হইবে; পরে ভুবর্ল্লোকের সর্ব্ব উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া কামদেহটি একেবারে ত্যাগ করে; ইহাকেই দ্বিতীয়বার মৃত্যু কহে।

তারপর মানসদেহ লইয়া স্বর্গে যায়, সেখানেও স্তরে স্তরে উঠিতে উঠিতে সর্ব্ব উচ্চে গিয়া বিশ্রাম করে; তৎপরে আবার পৃথিবীর দিকে গতি হয়, অর্থাৎ স্থূলে গতি আরম্ভ হয়; তখন পিতা মাতার সাহায্যে স্থূল শরীর পাইয়া আবার কর্ম্ম করিতে থাকে; তখন আবার কিছু কিছু শিক্ষা হইতে থাকে; প্রত্যেক জীবনে কিছু কিছু শিক্ষা হইয়া বহু জন্মের পর যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভক্তিতে পটু হন, তখন আর জন্ম হয় না, এই জন্মরহিত হইলেই আমাদের সব দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়া যায়; এইরূপে মনুষ্য স্থূল (ক) হইতে সূক্ষ্মে (জ) উঠিতেছে, এবং স্বর্গবাসের পর আবার সূক্ষ্ম (জ) হইতে স্থূলে (ক) নামিতেছে। গ চিহ্নিত স্থানে জন্ম ও খ চিহ্নিত স্থানে মৃত্যু হয়; ক জীবনের ঠিক্ মধ্যস্থল। যিনি যত বয়সেই মরুণ না কেন ক তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থল। যতদিন সেই অনন্ত শক্তিতে,সেই অগাধ জলরাশিতে,সেই অনন্ত অপরিসীম তেজরাশিতে মিশিতে না পারিব, ততকাল এই যাতায়াত করিতেই হইবে।

এ স্থলে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইল।

ভূর্লোক বা পৃথিবী।

ভূর্লোক বা পৃথিবী ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ভূর্লোক যে পদার্থে প্রস্তুত, তাহাকে ক্ষিতিতত্ত্ব কহে; ইহাকেই লোকে ইহলোক বলিয়া থাকে। ইহা কঠিন, তরল, বাষ্প ও ইথরে নির্ম্মিত; ইথর অন্য তিনটি অপেক্ষা লঘু; এই ইথর আবার একটি নহে; ইহা চারি প্রকার, যথা ১ম ইথর। ২য় ইথর। ৩য় ইথর। ৪র্থ ইথর। মোট এই সাতটি পদার্থের মিশ্রণে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ইথর অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণ লঘু ও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থের নাম অপতত্ত্ব (Astral-Matter)। তেজস্তত্ত্ব (Mental Matter) ইত্যাদি। অপতত্ত্বে প্রস্তুত জগতের নাম ভুবর্লোক; ইহাও আবাব সেই ভূর্লোকের ন্যায় সাতটি সূক্ষ্ম উপাদানে প্রস্তুত; ইহারাও আবাব ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ও লঘুতর। এই ভুবর্লোক কতকাংশ ভূর্লোকেব অন্তর্নিবিষ্ট; আবার এই অপতত্ত্ব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ আছে; তাহাকে তেজস্তত্ত্ব কহে। ইহারও ঐরূপ সাতটি স্তর আছে; ইহার দ্বারা যে জগৎ সৃষ্ট, তাহার নাম স্বর্লোক। স্বর্লোকের কতকাংশ ভুবর্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট। ঠিক এইরূপ অপরাপব লোক সকলও সূক্ষ্মতম ও লঘুতম উপাদানে প্রস্তুত হইয়া একটির মধ্যে অপরটি অবস্থান করিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটি অপরটির বাহিরেও কতকদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে।

পরলোক।

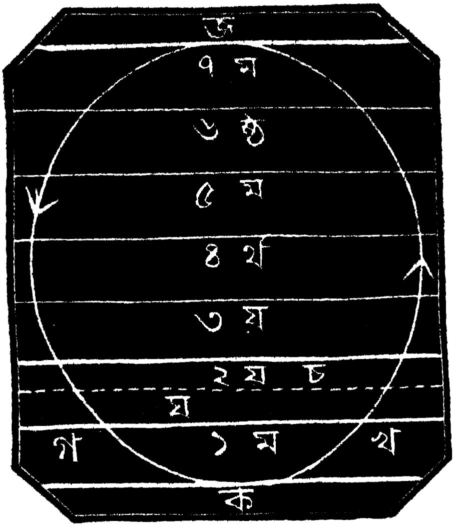
এস্থলে আমরা একবাব পরলোক সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক মনে করি। অনেকেই মনে করেন বা বিশ্বাস করেন, পবলোক একটি বহুদুব-দূরান্তরে স্থিত; বাস্তবিক তাহা নহে। সমস্তই এই ভূর্লোক অর্থাৎ পৃথিবীতেই ওতপ্রোতভাবে স্থিত। এই পরলোক অনেকগুলি; যথা—ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহঃলোক, জনঃ-লোক, তপঃলোক, সত্যলোক।

যেমন রসের মধ্যে রসগোল্লা থাকে; আবার রসগোল্লার মধ্যেও রস থাকে; তদ্রূপ ভূর্লোক মধ্যেই ভুবর্লোক, স্বর্লোক ইত্যাদি, যেন পরস্পর মিলিত সংশ্লিষ্ট; যেমন মৃত্তিকা মধ্যে জল, বায়ু ও ইথর থাকে; যেমন জলের মধ্যে বায়ু অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, যেমন বায়ু মধ্যে ইথর অদৃশ্যভাবে অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ ভূর্লোক মধ্যে ভুবর্লোক, আবার ভুবর্লোক মধ্যে স্বর্লোক ইত্যাদি ক্রমে অন্তর্নিবিষ্ট থাকে; কিন্তু ভূর্লোকের বাহিরেও কতকদূব পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, আবার ভুবর্লোকের বাহিরেও কতকদূর পর্য্যন্ত স্বর্লোক; স্বর্লোকের বাহিরেও কতকদূর পর্য্যন্ত মহঃলোক এইরূপে অবস্থিত। ভুবর্লোকে সাতটি স্তর আছে; নিম্নতম স্তবটি অপতত্ত্বের স্থূল পরমাণু দ্বারা, তদূর্দ্ধের স্তর অপতত্ত্বের তরল ও তদূর্দ্ধে অপতত্ত্বের বায়বীয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এইরূপে সাতটি স্তর ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত। তদূর্দ্ধে মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য এই সমস্ত লোকই প্রত্যেকটী ঐরূপ সাত সাতটী স্তরে বিভক্ত এবং তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত।

ভুবর্লোকের মধ্যে প্রেতলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থলেই

স্থূলতম স্পন্দনই উৎপন্ন হয়, অন্য স্পন্দন হয় না; উচ্চস্পন্দন একেবারেই উৎপন্ন হয় না, কারণ ইহা অপতত্ত্বের স্থূলতম পরমাণু দ্বারাই নির্ম্মিত। পিতৃ-লোকের চিন্তাসকল প্রেত লোকের ন্যায় তত সকাম না হইলেও নিষ্কাম নহে, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চচিন্তা, উচ্চ বাসনা-প্রবণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সুখদ; প্রেত-লোকের ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নহে। ভুবর্ল্লোক স্বার্থশূন্য স্থান নহে, কিন্তু স্বর্গে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। স্বর্গের প্রকৃত অবস্থা আমাদের বোধের অতীত, কারণ আমাদের জ্ঞান পৃথিবীর সম্বন্ধে; যাহা পৃথিবীতে অতি সুন্দর, অতি সুখদ, তাহারই সহিত তুলনা করিব, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের কোন অংশের তুলনা হইতে পারে না। যাহা আমরা খুব সুন্দর, অতি সুখদ বলিয়া মনে করি, তাহারই উপমা দিতে পারিব; কিন্তু তাহা ভূর্ল্লোকের সুতরাং তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। লোক সম্বন্ধে বুঝিবার জন্য একটি ছবি দিলাম, তাহাতে ঠিক বুঝা না যাইলেও কতকটা অনুভব করা যাইবে। যদিও ইহা একদিকে দেখান হইল কিন্তু দশদিকেই এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১ম ভূর্ল্লোক অর্থাৎ পৃথিবী। ২য় ভুবর্ল্লোক। ৩য় স্বর্ল্লোক হইতে ৭ম সত্যলোক পর্য্যন্ত স্বর্গলোক বলিয়া কথিত হয়। ভুবর্ল্লোকের কতক অংশ ভূর্ল্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং ১ম, ২য় ভুবর্ল্লোক। ভুবর্ল্লোক আবার দুইভাগে বিভক্ত; নিম্নাংশ (খ) প্রেতলোক; আর উচ্চাংশ (চ) পিতৃলোক, ১ম, ২য়, ৩য় স্বর্ল্লোক। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ মহঃলোক। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, জনঃলোক। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, তপঃলোক। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, সত্যলোক কিন্তু প্রত্যেক উচ্চলোকের উচ্চাংশে



কোন তন্নিম্ন লোক নাই, অথচ প্রত্যেক নিম্ন লোকের মধ্যে সকল উচ্চলোকই কিছু না কিছু অন্তর্নিবিষ্ট। পিতৃলোকের পর হইতেই স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়। সাধারণ মানব প্রায়ই স্বর্লোক হইতে ভূর্লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কিন্তু মহাত্মা অর্থাৎ যাঁহাদের কারণ দেহ ভালরূপে গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের গতি নিজ নিজ অবস্থানুসারে উৰ্দ্ধ, উৰ্দ্ধতর, উৰ্দ্ধতম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নারদাদি ঋষিগণ সত্যলোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারেন।

পৃথিবী বা ভূর্লোক ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা কঠিন, তরল, বাষ্প ও ইথরে নির্ম্মিত। ইথর অন্য তিনটি অপেক্ষা লঘু। আবার ইথর অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ লঘু বা সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থের নাম অপতত্ত্ব, (Astral-Matter) তেজস্তত্ত্ব (Mental-Matter) ইত্যাদি এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় আধুনিক বিজ্ঞান অবগত নহে।

এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা পরলোক নির্ম্মিত; যেমন মৃত্তিকা মধ্যে জল, জল মধ্যে বায়ু, বায়ু মধ্যে ইথর ক্রম পরম্পরা ক্রমে অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, অথচ অনুভব করা যায় না; তদ্রূপ লোক সকল পরস্পরের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। পরলোক একটা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থিত নহে; ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আমাদের এই নগর, গ্রাম, বাজার, ঘর, বাড়ী, ঘাট ও পথের মধ্যেই অবস্থিত। কত মৃত আত্মীয় অর্থাৎ ভুবর্লোকের কত ব্যক্তিই হয় ত আমাদের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি আমাদের সূক্ষ্মদেহ দেখিতেছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছি না; তাহার কারণ এই, আমাদের শরীর বা ইন্দ্রিয় সকল ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ স্থূল পদার্থে নির্ম্মিত, সুতরাং সীমাবদ্ধ। ইহার উপরের সূক্ষ্মবিষয় দেখিবার শক্তি নাই। স্থূলতত্ত্বে প্রস্তুত ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্মবিষয়ের জ্ঞানে অক্ষম। বায়ু যেমন সূক্ষ্ম পদার্থ, দর্শন ইন্দ্রিয় তদপেক্ষা স্থূল পদার্থে নির্ম্মিত, সুতরাং বায়ু দেখিতে পাই না। স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সুতরাং বায়ু স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইথর বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সুতরাং ইথর আমরা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না; তদ্রূপ আমরা স্থূলশরীরী অর্থাৎ অন্নময় কোষে আবদ্ধ, সুতরাং ইথর অপেক্ষা সূক্ষ্ম অপতত্ত্ব দ্বারা নির্ম্মিত যে সূক্ষ্মদেহ, তাহা কি প্রকারে দেখিতে পাইব? যাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহারা সেই সূক্ষ্মদেহ এবং স্থূলদেহ উভয়ই দেখিতে পান। তাঁহাদের পক্ষে ইহলোক ও পরলোক আর মৃত বা জীবিত সবই সমান। তিনি ইহলোকস্থিত বা পরলোকগত অর্থাৎ মৃত বা জীবিত সকলের সহিতই সমান ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন; কিন্তু আমরা এই চর্ম্মচক্ষুতে সূক্ষ্ম জগৎ বা সূক্ষ্ম দেহ দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই

না বলিয়া তাহা ধারণা করিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও মন চাহে না; কিন্তু ইহা সকলেরই বিবেচনা করা উচিত যে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না, তাহা অনেক যন্ত্রদ্বারা (অনুবীক্ষণ আদি) দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এমন অনেক বিষয় আছে।

কিন্তু আমরা যখন নিদ্রিত হই, তখন পরলোকগত অর্থাৎ কামদেহবিশিষ্ট মৃতব্যক্তিদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমরা নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-দেহ লইয়া পরলোকে গমন করে। (সেই জন্য বিছানাকে লোকে মৃতশয্যা কহে, বিছানা স্পর্শে অশুচি জ্ঞান করে)। ঐ সময় একটি সাদা রৌপ্যবৎ সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা স্থূলদেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহের যোগ থাকে; এই সূক্ষ্মসূত্রটি ছিন্ন হইলেই মৃত্যু হয়; মৃত্যু ও নিদ্রাতে ইহাই প্রভেদ মাত্র; এই নিদ্রাকালে আমাদের সহিত মৃতব্যক্তিদের পরলোকে দেখা হয়, নিদ্রাভঙ্গে আমাদের তাহা স্মরণ থাকে না; কখন কখন দু-একটি যাহা মনে থাকে, তাহা স্বপ্নজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকি। নিদ্রাভঙ্গে যেই স্থূলজগতে আসি, আর সূক্ষ্মদৃষ্টি ঘুচিয়া যায়; কারণ স্থূলশরীরী হইয়া পড়ি, সুতরাং আর সূক্ষ্মজ্ঞান থাকে না। এই সময় আর তাঁহাদের আমরা দেখিতে পাই না, অথচ তাঁহারা আমাদের অতি নিকটে থাকেন; কিন্তু তাঁহারা আমাদের সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পান। আমরা যখন যাহা করি, তাঁহারা আমাদের সূক্ষ্মদেহে তাহা দেখিতে পান; সময় সময় তাঁহারা আমাদের সাবধান করিয়া দেন এবং সান্ত্বনা করেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সে সকল কথা শুনিতে পাই না; কেন না, তখন আমরা স্থূলদেহে থাকি। অনেক সময় তাঁহারা অদৃশ্যভাবে আমাদের উপকারও করেন।

অনেকে ভাবেন, নিদ্রার সময়টা আমাদের বৃথা যায়, বাস্তবিক তাহা নহে; অবিরাম মস্তিষ্ককে কাজ করাইলে পাগল হইয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া, নিদ্রিতাবস্থায় মহাত্মাদের নিকট অনেক উপদেশ পাইয়া থাকি এবং পরোপকারের তীব্র ইচ্ছা থাকিলে ঐ সময় অনেকের অনেক উপকারও করা যায়। শয়নের পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তির ঐকান্তিক উপকারের ইচ্ছা করা যায়, তবে নিদ্রিতাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে তাহার উপকার করা যায়, কিন্তু মনে থাকে না। যদি মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যায় যে, সেই সেই লোকের উপকার হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় অনেকে প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন। অনেক সময় ধন্না দিয়া প্রত্যাদেশে ঔষধাদি পাইতে শুনা যায়। আমি শুনিয়াছি, কোন লোক শ্বাসকাস (এ্যাজমা) রোগে বহুকাল কষ্ট পাইয়া তারকেশ্বরে ধন্না দেয়, তিনদিন পরে আদেশ হইল, "চরণামৃত খাইতে গিয়া নর্দ্দমাতে যে জন্তু দেখিতে পাইবি, সেইটী তিনদিন খাইবি;" নর্দ্দমাতে চরণামৃত খাইতে গিয়া দেখে, একটি আরসুলা রহিয়াছে; তাহাই লইয়া আসিয়া সিদ্ধ করিয়া জল খাইয়া আরোগ্য হইল। আরসুলা (ব্লাটা) হোমিওপ্যাথগণ জানেন—এ্যাজ্‌মার ঔষধ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষিতিতত্ত্ব, অপতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্বসকল সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে; তাহাদের বিভিন্ন স্পন্দনে মানবের বিভিন্ন জ্ঞান বা অনুভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপতত্ত্বের স্পন্দনে মানবের সূক্ষ্মদেহ স্পন্দিত হইয়া নানাপ্রকার মনবৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, মায়া, ইত্যাদি নানাপ্রকার বাসনা বা কামনা উৎপাদন করে। অপতত্ত্বের আবার নানাপ্রকার স্তর আছে। অপতত্ত্বের সেই বিশেষ বিশেষ স্তরের স্পন্দনে, সূক্ষ্মদেহকে স্পন্দিত করিয়া বিশেষ বিশেষ

কামনার উদয় করিয়া দেয়। অপতত্ত্বের নিম্ন স্তরের স্পন্দনে নীচ কামনা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদির উদয় হয়; আর উচ্চতর স্পন্দনে সৎকামনা দয়া, জ্ঞান, পরোপকারের ইচ্ছা ইত্যাদির উদয় হয় সুতরাং ভুবর্লোক আদি লোক সকলের স্পন্দনে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; ঐ স্পন্দন আমাদের সূক্ষ্মদেহের স্পন্দন উৎপন্ন করিয়া কামনার বা বাসনার উদয় করিয়া দেয়। অপতত্ত্বের স্থূলস্তরের স্পন্দনে আমাদের কামদেহের স্থূল পরমাণুগুলি স্পন্দিত হয় বলিয়া নীচ প্রবৃত্তিগুলির উদ্রেক হয়; আর অপতত্ত্বের সূক্ষ্মতর স্পন্দনে আমাদের কামদেহের সূক্ষ্ম পরমাণুর স্পন্দন উৎপন্ন হয় বলিয়া দয়া আদি সৎপ্রবৃত্তিগুলির উদয় হয়।

আবার এই কামদেহের স্পন্দন কেবল কামদেহেই আবদ্ধ থাকে না, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া অন্য লোকের সূক্ষ্মদেহকেও স্পন্দিত করিয়া তাহার মনেও ঐ সকল বাসনার উদয় করিয়া দেয়; তাই লোকে বলে—সৎসঙ্গে কাশীবাস ও অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ; সুতরাং কুচিন্তা দ্বারা কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করা হয় এমত নহে, নিকটস্থ অপরেরও অনিষ্ট করা হয়; তাই নীচলোকের বিছানায় বসা, নীচ লোকের অন্ন ভক্ষণ করা, স্রোতের নীচের দিকে স্নান করা, ইত্যাদি নিষেধ আছে।

আবার কাহারও কামদেহে অপতত্ত্বের স্থূল পরমাণু, কাহারও কামদেহে সূক্ষ্ম পরমাণু বেশী। যাঁহাদের কামদেহে সূক্ষ্ম পরমাণু বেশী, তাঁহাদের স্থূল পরমাণুর অংশ কম; তাঁহার উপর অপর নীচ ব্যক্তির কুচিন্তার স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে না। উচ্চব্যক্তির সৎচিন্তার স্পন্দনে তাঁহার মনকে স্পন্দিত করিয়া উচ্চ বা সৎচিন্তার বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে; আর নীচলোকের নীচ বা কুচিন্তা, নীচ

ব্যক্তির মনকে স্পন্দিত করিয়া তাহার কুচিন্তার বল বৃদ্ধি করে; কারণ তাহার কামদেহের স্থূল পরমাণুর সংখ্যা বেশী থাকায়, অন্য নীচব্যক্তির কুচিন্তা তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারে। একটি উপমা দ্বারা আমরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিব। যদি দু-চারিটি বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধা থাকে, এবং অপর দু-চারিটি অন্য সুরে বাঁধা থাকে, তবে প্রথমগুলির কোনটিতে আঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিলে বেশ বুঝা যায় যে, সেই সুরে বাঁধা অপরগুলির ভিতর হইতে ঝঙ্কার উঠিতেছে অর্থাৎ বাজিতেছে; কিন্তু অন্য সুরে বাঁধাগুলি একটুও স্পন্দিত হয় নাই। আবার যদি দ্বিতীয়গুলির মধ্যে কোনটিতে আঘাত করা যায়, তবে প্রথমগুলি স্পন্দিত হয় না, দ্বিতীয়গুলি স্পন্দিত হইতে থাকে অর্থাৎ বাজিতে থাকে; তদ্রূপ যাহার মন যে প্রকার, সে ব্যক্তি সেই প্রকার লোকের চিন্তাস্রোতে সেইরূপ চিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়ে; কিন্তু যাঁহাদের কামদেহে সূক্ষ্ম পরমাণু বেশী, নীচ বা কুলোকের কুচিন্তায় তাঁহাদের মনের স্পন্দন উৎপন্ন হয় না; কিন্তু যাহাদের কামদেহের স্থূল পরমাণুর সংখ্যা বেশী বা সূক্ষ্ম পরমাণু ও স্থূল পরমাণু সমান, তাহাদের উপর নীচ লোকের নীচচিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়া কুচিন্তা উৎপাদন করিয়া স্থূল পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া ভীষণ অনিষ্ট সাধন করে; তজ্জন্যই সদা সর্ব্বদা নীচলোক হইতে পৃথক থাকা আমাদের কর্ত্তব্য।

ভূর্লোকের গ চিহ্নিত স্থানে মানবের জন্ম হয়, আর খ চিহ্নিত স্থানে মৃত্যু হইয়া থাকে; তৎপরে ভুবর্লোকের (ঘ) প্রেতলোক (চ) পিতৃলোক, পরে ক্রমশঃ একটি একটি দেহ ত্যাগ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ (জ) দিকে গতি হইতে থাকে; যাঁহাদের কারণ শরীর সুগঠিত হইয়াছে, তাঁহারা বহুদূর পর্য্যন্ত, এমন কি সপ্তম স্বর্গ (জ)

পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকেন, অন্যথায় অধিকাংশ লোকেরই স্বর্লোক (৩য়) হইতে পৃথিবীর দিকে গতি হয়, গ স্থানে জন্ম হয়; (ক) জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী স্থান; (খ) মৃত্যুর স্থান, মৃত্যুর পর আবার ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ (জ) দিকে গতি হয়, আবার ঊর্দ্ধদিক (জ) হইতে ক্রমশঃ স্থূল হইতে হইতে নীচের দিকে গতি হইয়া (গ স্থানে) জন্ম হয়। পুনর্ব্বার কর্ম্মফল-ভোগ করিতে আসিয়া আবার নূতন নূতন কর্ম্ম প্রস্তুত করিতে থাকে। কর্ম্মরূপ বৃক্ষ উৎপাটন করিতে আসিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অসংখ্য আগাছার বীজ ছড়াইয়া ফেলে। এই-রূপে আমাদের প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে আবর্ত্তন হইতেছে।

মনুষ্যের জীবিতাবস্থায় কামদেহের সকল স্তরের পরমাণুগুলি মিশান থাকে, অর্থাৎ কামদেহের স্থূল সূক্ষ্ম সকল পরমাণুগুলিই মিশ্রিত থাকে; কিন্তু মৃত্যুর পর স্থূল পরমাণুগুলি উপরে, সূক্ষ্মগুলি নিম্নে, অতি সূক্ষ্মগুলি আবার আরও নিম্নে পড়িয়া সাতটি স্তরে যেন সাজান হয়; ইহার নাম কামদেহের পুনর্গঠন। ঐ কামদেহের বহিরাবরণ যে পরমাণুতে নির্ম্মিত হয়, কামলোকের ঠিক সেই স্তরে দেহটা যেন বাধিয়া যায়, সুতরাং বহিরাবরণের পরমাণুর জাতি বা স্থূল সূক্ষ্মতানুসারে প্রেতলোক, পিতৃলোকে বা স্বর্গলোকে গতি হয়।

ভুবর্লোকে সূক্ষ্মদেহের স্থূল পরমাণুগুলি ঝরিয়া গেলে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর তাহার ঊর্দ্ধে স্বর্লোকে গতি হয়। যাঁহাদের কারণ দেহ সুগঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের গতি বহুদূর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তথাকার অবস্থা অতি আনন্দ-দায়ক, বর্ণনাতীত সুখদ; তথায় স্বার্থ কাহাকে বলে, তাহার লেশ মাত্র নাই, নিজ আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন এবং তথায় নিজ প্রকৃত্যনুযায়ী মহাত্মাগণের নিকট শিক্ষিত হইতে থাকেন।

যাহারা কুচিন্তা দ্বারা নিজের কামদেহের স্থূল পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে বা করিতেছে, মৃত্যুর পর নিম্নস্তরে যাইয়া তাহাদিগকে দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইবে; অতএব কুচিন্তা দ্বারা কামদেহের স্থূল পরমাণু সকল বৃদ্ধি করিয়া দুঃখ পাইবার জন্য প্রস্তুত হইও না।

মানব জীবিতাবস্থায় অন্নময়কোষে বদ্ধ থাকায়, তাহার কুবাসনা সকল ক্ষিতিতত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে; সুতরাং কতকটা বেগ কমিয়া যাওয়ায় বা ব্যয় হইয়া যাওয়ায়, বাসনাস্রোত ধীরভাব ধারণ করে; কিন্তু অন্নময়কোষ খসিয়া গেলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর সে বাধা না থাকায়, প্রেতলোকে ঐ কুচিন্তা সকল দুর্দ্দমনীয় হইয়া ও প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পাইয়া, পাপীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও উন্মত্ত প্রায় করিয়া তোলে; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মন্দ প্রবৃত্তিগুলি একেবারে এমন প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠে যে, সে তাহাদিগকে কোন প্রকারে দমন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি অতি কৃপণ, সে তাহার অতি যত্নের সঞ্চিত প্রাণতুল্য অর্থ সকল, অপরে অযথা ব্যয় করিতেছে দেখিয়াও নিষেধ করিবার শক্তি না থাকায়, নিবারণ করিতে না পারিয়া, কাতর হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি সংশয়চিত্ত ছিল, স্ত্রীকে কাহারও সহিত কথা কহিতে বা ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে পারিত না, সে তাহার স্ত্রীকে অপরের সহিত আমোদ করিতে বা অযথা ব্যবহার করিতে দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে থাকে। রাগী ব্যক্তি—যে কাহারও সামান্য কথা সহিতে পারিত না, আজ তাহার নিন্দা, গ্লানি, অপমানের কথা সকর্ণে শুনিয়াও কিছু বলিতে না পারিয়া ক্রোধে অন্ধ হইতে থাকে।

পরস্ব-অপহারক অপহরণ-প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়নায়, ঘাতক আঘাতের জ্বালায়, প্রতারক প্রতারণার দুর্দ্দমনীয় জ্বালায় দারুণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

পেটুক ক্ষুধার প্রবল তাড়নায়, কামুক কামের জ্বালায়, ধনলোভী ধনসঞ্চয়ের প্রবল ইচ্ছায়, মাতাল মদ্যপানের দুর্দ্দমনীয় লালসার ভীষণ যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত পেটুক ব্যক্তির হস্তপদ বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে উপাদেয় খাদ্য সকল রাখিয়া তাহাকে খাইতে বলা যায়, তবে তাহার যে দশা হয়, তাহাদেরও সেই অবস্থা হয়।

এইরূপ অসংখ্য পাপী অসংখ্য পাপের পৃথক পৃথক শাস্তি ভোগ করিতে থাকে; কিন্তু ভোগ্যবস্তুর অভাব এবং ভোগের যন্ত্রস্বরূপ স্থূলদেহেরও অভাব সুতরাং তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা সবিশেষ অনুভব করা আমাদের মত লোকের অসম্ভব; ইহাকেই শাস্ত্রে নানাপ্রকার নরক কহিয়া থাকে।

এইরূপে প্রেতলোকে কিছুকাল ভুগিতে ভুগিতে তাহার কামনা সকল ক্ষীণ হইয়া যায়; তখন বাসনা বা কামনাদেহের কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়া যায়। এই ভোগকাল সকল ব্যক্তির সমান নহে। যে ব্যক্তি যত আসক্তিসহকারে ঐ সকল কুকার্য্য বা কুচিন্তা করিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই অধিক এবং ততই যাতনা-দায়ক। মনে কর, কোন একটি তানপুরার তার যদি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার স্পন্দন বা ঝঙ্কার জোরে হয় ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়; আর যদি অল্প টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ঝঙ্কার ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে তদ্রূপ যে যে প্রবৃত্তি, যে চিন্তা বা যে কার্য্য যত আসক্তি সহকারে

চালনা করিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই বেশী ও ততই সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক; আর যিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাহার ভোগফল ও যন্ত্রণা অল্প।

বাসনা-দেহের কতকগুলি পরমাণু ঝরিয়া যাওয়ার পর, সে পিতৃলোকে উন্নীত হইয়া থাকে। এখানেও বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল চিন্তা। মান, সম্ভ্রম, যশঃ, প্রতি-পত্তি, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে তাহার আসক্তি বা বাসনা ছিল, সেইগুলি জাগিয়া উঠে। এই সকল লাভের জন্য, তখন সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে এইগুলিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তখন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়; তৎপরে সে ভাবনাদেহ লইয়া স্বর্গে (স্বর্লোকে) গমন করে। বাসনাদেহটী কামলোকে পড়িয়া থাকে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

স্বর্গে তাহার নিঃস্বার্থ দয়া, ভক্তি, পরোপকার ইত্যাদি সৎগুণ সকল জাগিয়া উঠে; তাহাতে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। কাজেই অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া পরম সুখে সুখী হইয়া থাকে। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে, তাহার ভাবনা-দেহ খসিয়া যায়, অর্থাৎ তৃতীয়বার মৃত্যু হয়; (আমাদের মত সাধারণ মানব পৃথিবী, ভুবর্ল্লোক ও স্বর্ল্লোক এই তিন লোকেই যাতায়াত করে) তখন আরও উচ্চতম স্বর্গে গমন করে কিম্বা যাহাদের কারণ-শরীর সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হয় নাই, তাহাদের ভোগের জন্য পুনর্ব্বার পৃথিবীর দিকে গতি হয়। অতঃপর পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা-বলে স্বর্গ-লোক ও ভুবর্ল্লোক ভেদ করিয়া এবং সেই সেই উপাদানে গঠিত একটি নূতন দেহ লাভ করিয়া, আবার কর্ম্মফলভোগের জন্য

পৃথিবীতে নিজের উপযুক্ত মাতা-পিতার ঔরসে ও বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে এবং পুনর্ব্বার নূতন নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

শুচীনাং শ্রীমত্যাং গেহে
যোগভ্রষ্টঽভিজায়তে ॥ ৬ ॥ ৪১ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচী ও শ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করে। তদ্রূপ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঘরে জন্ম হইয়া থাকে। প্রেত-লোকে এই সকল যন্ত্রণার হ্রাস করিবার জন্য ও উর্দ্ধগমনের পথ সহজ করিবার জন্য শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। মুসলমান ও খৃষ্টান-দিগের এই কার্য্য সাধনের জন্য কেবল উপাসনাদির ব্যবস্থা আছে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে ঋষিগণ কেবলমাত্র উপাসনা-আদির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তৎসহ মন্ত্র নিয়োজিত করিয়া সেই পথ আরও সুগম করিয়াছেন। ইহাতে উপাসনার মানসিক শক্তি ও মন্ত্রশক্তি দুইপ্রকার বল নিয়োজিত হওয়ায়, উক্ত ক্রিয়া উৎকৃষ্টরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে কিন্তু যদি পুরোহিত ও যজমান ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানী হন, তবে ঐ কার্য্যে যথোচিত ফললাভ হইয়া থাকে; তদ্বিপরীতে পুরোহিত ও যজমান মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মূর্খ, অধার্ম্মিক, অজ্ঞানী ও এ বিষয়ে অবিশ্বাসী হইলে বিশেষ কোন ফল দর্শে না, অতি অল্প ফল দর্শে কিম্বা বৃথা হয়। ভাণ্ডদেহ হইতে পিণ্ডদেহের আসক্তি নষ্ট করিবার জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও দশপিণ্ড দেওয়া, পিণ্ডদেহ মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধাদি, বাসনাদেহ মোচনের জন্য সপিণ্ডকরণাদি এবং ভাবনা-দেহের যন্ত্রণা কমাইবার জন্য ও উর্দ্ধগমনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। দয়াময় ঋষিগণ

মানব-দুঃখে কাতর হইয়া কি না করিয়াছেন ও করিতেছেন? তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের অসাধ্য হইলেও সেই ঋণ-মোচনের অতি সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, সেই সামান্য কার্য্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও নিজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিতে আলস্য, ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি।

পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের স্মৃতি না থাকিলেও সংস্কার থাকে; স্মৃতি ও সংস্কার প্রায় একই জিনিষ; স্মৃতি নষ্ট হইয়া তাহার একটা যে দাগ থাকে, তাহার নাম সংস্কার। যেমন কেহ কোন পরিচিত ব্যক্তিব নাম ভুলিয়া গেলে, যদি তাহার অযথার্থ নাম উল্লেখ করা যায়, তবে সে একেবারেই অস্বীকার করে; মনে কব, সেই ব্যক্তির নাম 'নগেন্দ্র', যদি তাহার স্মবণার্থ কেহ 'হরি' নাম উল্লেখ করে, তবে সে একেবারেই অস্বীকাব করে, কিন্তু দেবেন্দ্র বা যোগেন্দ্র নাম উল্লেখ করিলে, সে বলে, ঐ প্রকারের বটে, দেবেন্দ্র নহে, যোগেন্দ্রও নহে কিন্তু ঠিক ঐ প্রকাবের; পরে 'নগেন্দ্র' বলিলে সে একেবারে আনন্দের সহিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করে; ইহারই নাম সংস্কার। স্মবণ ছিল না বটে, কিন্তু নামের একটা দাগ ছিল, তাই অযথার্থ নামোল্লেখে অস্বীকার করিতেছিল এবং যথার্থ নাম শুনিবা মাত্রই আহ্লাদিত হইল, স্মরণ হইল; ইহারই নাম সংস্কার।

মানব পূর্ব্বজন্মের চিন্তা-গঠিত-স্বভাবের সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বহুদিনের অভ্যাসই স্বভাব। জন্মের পর হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বালকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে একত্রে খেলাপবায়ণ দুই তিনটি বালককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। একজন দয়া, স্নেহ, সরলতামাখান শান্ত,

ধীর; আর অন্যটী নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ক্রুর-প্রকৃতিবিশিষ্ট দুষ্ট ও অস্থির; দুইজনই শিশু, কিন্তু কত বিভিন্ন; ইহা তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত না বলিয়া কি বলিব? ইহাতে অনুমান করা যায় যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের যে চিন্তা দ্বারা যেমন স্বভাব গঠন করিয়াছিল, সে তাহাই লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল, সে তাহা সহজে বুঝিতে পারে এবং সহজে ও অক্লেশে শিক্ষা করিতে পারে; শিক্ষক ভ্রমে পতিত হইলে, তাহার প্রতিবাদ করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না; কারণ সেই বিষয়ের সংস্কার থাকায় তাহাতে তাহার সন্দেহ থাকে না।

ভাবনা।—বহুদিন ধরিয়া চিন্তা, ভাবনা, অভ্যাস দ্বারাই স্বভাব গঠিত হয়। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" আমাদের দৈনিক চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি গঠিত হইতেছে সুতরাং পরজন্মকে নিজের মনের মত করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে; নীচ ও হেয় বিষয়ের চিন্তা কর, নীচ ও হীন প্রকৃতির হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সদা উচ্চ চিন্তা, সদাচরণ, পরদুঃখে কাতর, পরের মঙ্গল চিন্তা, পরকে শান্তিদানে জীবনযাপন কর, উচ্চ হইয়া জন্মিবে; ইহাই বিধির বিধান বা ঈশ্বরের নিয়ম; ইহাই প্রকৃতির কার্য্য; কখন ইহার অন্যথা হইবে না; কখন ইহার ব্যতিক্রম হইবে না।

বাসনা।—এজন্মে অত্যন্ত অর্থকামী হও, পরজন্মে অর্থ পাইবে, যে বিষয়ের জন্য ঐকান্তিকী কামনা হইবে, পরজন্মে তাহাই পাইবে, কিন্তু অর্থ হইলেই সুখী হওয়া যায় না। এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, বহু অর্থের মালিক হইয়াও ভীষণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; আবার তৎসহ কর্ম্মযন্ত্র নির্ভর করে।

কর্ম্মফল।—এ জন্মে যে যেমন কর্ম্ম করিবে,পরজীবনেও সেইমত পাইবে। লোককে সুখী করিয়া থাক, সুখী হইবে; কষ্ট দিয়া থাক, কষ্ট পাইবে, অর্থদান করিয়া থাক, প্রচুর অর্থ পাইবে, পরের দুঃখে কাতর হইয়া থাক, মানসিক সুখে সুখী হইবে।

সুতরাং চিন্তা, কামনা ও কর্ম্ম এই তিনটী পরজীবনের উন্নতি-অবনতির আশ্রয়; এবারে যেমন করিয়া যাইবে, যেরূপ চিন্তায় মনকে যেমন করিয়া গড়িয়া লইবে, পরজীবন সেইরূপে নিয়মিত হইবে; এ জীবনে যেমন কামনা করিয়া যাইবে, যেমন কর্ম্ম করিবে, পরজীবন সেইরূপে গঠিত, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এমন লোক জগতে দেখা যায় যে, নিজ কর্ম্মফলভোগ করিতে আসিয়া, নিজ পাপের ফল স্বরূপ দুঃখভোগ করিতে আসিয়া, জ্বালাতন হইয়া, দারুণ যাতনার অবসান হইবে ভাবিয়া, উন্মত্তের ন্যায় আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। তাহাতে দুঃখের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়; যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন না করিলে রোগ উৎপন্ন হয়; তন্নিবারণের উপায় ঔষধ; তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপে আধ্যাত্মিক ও মানসিক ব্যাধিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ক্লেশ-ভোগ ব্যতীত পাপক্ষয়ের অন্য কোন উপায় নাই। যখন পাপের ফল স্বরূপ দুঃখভোগ হইতে থাকে; তখন সাহস ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সকল দুঃখ, সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করা উচিত কিন্তু তাহা না করিয়া কোন কোন হতভাগ্য শোক-তাপে অভিভূত হইয়া হতাশ হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণার অবসান হইবে ভাবিয়া, উন্মত্তের ন্যায় আত্মহত্যা করিয়া ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে যে, সে ভয়ানক অন্যায় করিয়াছে; কারণ তদ্দ্বারা দেহ নাশ হইলেও মানসিক যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি

পায় না। ইহ-জীবনের ন্যায় পরলোকেও ঠিক সেইরূপ ভোগ হইতে থাকে। বিধির বিধানে মানবের ভোগকালস্বরূপ পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হয়; সেই নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে কার সাধ্য? যে-রূপেই হউক, পূর্ণ হইবেই হইবে। সেই নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল কেহ নিজ ইচ্ছায় নিঃশেষ করিতে পারে না। আত্মহত্যাকারী স্বকৃত দুরদৃষ্টের ফল এড়াইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায়, বোকার ন্যায়, নিজের অমূল্য জীবন ত্যাগের পরই সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে। দেহ-ত্যাগের পর সেই শোক, তাপ, দুঃখ, ক্লেশের, যন্ত্রণার বেগ তাহাকে তীব্রভাবে যাতনা দিতে থাকে; তখন সে আত্মীয় বন্ধু ত্যাগজনিত আরও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অতি ভীষণ ও লোমহর্ষণকর। হতভাগার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর! ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে!!

কিন্তু যদি কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হয়, তবে সেই সৎ ও অসৎ ব্যক্তিদের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয় প্রকার কর্ম্ম তাহাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যাঁহারা সৎ সাধু ও নির্দ্দোষী, তাঁহারা সুখ-স্বপ্নময় তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকিয়া জীবনকাল অতিবাহিত করেন; আর পাপাসক্ত ও কামাতুর মানবগণ তাহার নির্দ্দিষ্ট জীবনের পরিমাণ কাল অতি বিষণ্ণভাবে, দীনভাবে, দারুণ যাতনার সহিত কামলোকে বাস করে। তাহাদের বিষয়-বাসনা, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে অথচ সুযোগ অভাবে কামনাপূরণে অক্ষম থাকে; কাজেই অসৎ ও পাপীর দশা অতি ভীষণ ও শোচনীয়। যে ব্যক্তি মূখ্যভাবে নিজ-দায়িত্বে আত্মহত্যা করে, তাহার কঠোর যাতনা ভোগ হয়;

আর যিনি পরের মঙ্গলের জন্য কিম্বা অপঘাতে মরেন, তিনি সেরূপ শাস্তি ভোগ করেন না।

অপঘাত, আত্মহত্যা, রোগ বা পরমায়ুর অবসান যেরূপেই মৃত্যু হউক না কেন, আসন্ন মৃত্যুকালে অর্থাৎ যখন স্থূলদেহ হইতে পিণ্ড-দেহ ও সূক্ষ্মদেহ চিরকালের মত বাহির হইয়া যায়, সেই মুমূর্ষুকালের শেষ মুহূর্ত্তে জীবনের সমস্ত কৃত ঘটনাগুলি বাজীকরের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির স্মৃতিপথে আসিতে থাকে। হৃদ্-স্পন্দন লোপ হওয়ার পর হইতে শরীর একেবারে শীতল, জীবনী-শক্তির শেষ অগ্নিকণা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় স্মৃতিপথে আসিতে থাকে এবং সমস্ত ঘটনাগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া সমষ্টিভাবে একটি জ্যোতির্ম্ময় আকার ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে প্রতিফলিত হয়; সেই ব্যক্তির যে যে বিষয়ে সমধিক আসক্তি ছিল, যে যে বিষয়ে চিন্তা তীব্র, তীক্ষ্ণ বা উগ্র ছিল, তাহার বীজ সূক্ষ্মভাবে ঐ নূতনোৎপন্ন জ্যোতির্ম্ময় দেহে বদ্ধমূল হইয়া পরজীবনে স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা দোষরূপে আবির্ভূত হয়। গত-জীবনের সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্যের হিসাব করিবার সময় আত্মীয়দের আর্ত্তনাদ, বিলাপ ও কান্নার রোল তোলা বড়ই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। এই সময়টি অতি মহৎ ও মহান; কারণ ইহার উপর তাহার পরজীবনের সুখ দুঃখের কার্য্যাকার্য্যের নিয়ম গঠিত হইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাহার গতজীবনের সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে; তাহার গতজীবন কি জন্য, কি ভাবে চলিয়াছিল, তাহা সমস্ত দেখিতে পায়; তখন তাহার মোহাদি দোষ থাকে না; গতজীবনের ঘটনা সকল আলোচনা করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যায়।

এমন সময় তাহাকে কোনরূপে চঞ্চল করা আত্মীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির কখনই উচিত নহে; তাহার নিকট কাঁদিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিয়া তাহার হিসাবে গোল করা উচিত নহে; এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

মৃত্যুকালে যখন পিণ্ডদেহ, স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া তদুপরি শূন্যে ভাসিতে থাকে, তখন পূর্ণদৃষ্টি বা চৈতন্য আস্তে আস্তে লোপ হইয়া স্বপ্নবৎ শান্ত বা মৃদুভাব ধারণ করে। কখন কখন এই পিণ্ডদেহ ঘরের বাহিরে বা মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দেখা যায়। ইহা দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়া পড়েন।

যদি মরণকালে অত্যন্ত ভালবাসার বা স্নেহের পাত্র নিকটে না থাকে এবং তজ্জন্য তৎপ্রতি মন উদ্বিগ্ন বা আকৃষ্ট থাকে, তবে কখন কখন ঐ পিণ্ডদেহ তাহার বা অন্য কাহারও দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িতে পারে।

মৃত্যুর সময় যেমন স্থূলদেহ স্পন্দিত হইয়া পিণ্ডদেহ পৃথক হইয়া ছিল, তৎপরে পিণ্ডদেহও সেইরূপ আলোড়িত হইয়া সূক্ষ্মদেহ হইতে পৃথক হইয়া স্থূলদেহের ন্যায় শবরূপে পরিণত হইয়া যায়; এই পিণ্ডদেহ কখন কখন গোরের উপর বেগুণে বর্ণের কোয়াসার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন অজ্ঞ লোকেরা ইহা দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই।

এই স্থলে একটি সত্য ঘটনা বলি—হুগলি নর্ম্ম্যাণ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানশিক্ষক ইল্‌ছোবানিবাসী বাবু রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন বেলা ১টার সময় প্রথম শ্রেণীতে রঘুবংশ পাঠ দিতে দিতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি! আপনি কখন আসিলেন?" অথচ তৎকালে তথায় অন্য কেহই উপস্থিত ছিল না। তৎক্ষণাৎ

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—আমি যখন বহরমপুর কলেজে শিক্ষক হইয়া যাই, তৎকালে তথাকার ধনী বড়লোক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়; তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরিতে নানা ভাষার বিস্তর পুস্তক আছে, কলেজের ছুটীর পর আমি প্রত্যহ তাঁহার লাইব্রেরিতে পড়িতে যাইতাম, যে দিন যে পুস্তকখানি পড়িব ইচ্ছা করিতাম, গিয়া দেখিতাম, সেইখানি টেবিলের উপর রহিয়াছে, তাঁহার লাই-ব্রেবিতে পড়িতে না পাইলে আমার এতদূর জ্ঞান হইত না। তাঁহাকে আমি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐরূপ ভ্রম কথা বলিয়াছি, আজ আব পড়াইব না, তোমাদের ছুটি। ছেলেরা চলিয়া গেল। বেলা ৪টার সময় তিনি একখানি টেলিগ্রাম্ কাগজ হাতে লইয়া বোডিংয়ে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেদের বলিলেন, শোন, যে সময় আমি ডাক্তার রামদাস সেনকে ভ্রমচক্ষে দেখিয়া "কখন আসিলেন" বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এই টেলিগ্রাম্।

জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়াই যে আমরা এই চক্রে ভ্রমণ কবিব, তাহাও নহে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্ম-মৃত্যুব হাতে পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিব এবং পরিত্রাণের জন্য, পরম সুখের জন্য, পরম শান্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িব। আমরা সকলেই সুখেব অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু সুখের অন্বেষণে বিপথে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি; বিফল-মনোবথ হইয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখনই যথার্থ সুখ-লাভের ইচ্ছায় মুক্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি আসিয়া পড়িবে।

কোন ব্যক্তির পিতা তাহাকে সন্দেশ কিনিয়া আনিবার জন্য দুইটি টাকা দিয়াছিল; সে ময়রার দোকানে যাইতে যাইতে পথ-প্রান্তে এক মদের দোকান দেখিয়া চারি আনার মদ খাইল, তথন তাহার নেশা হওয়ায়, ময়রার দোকানের পথ ভুলিয়া অন্যান্য দ্রব্যের দোকানে সন্দেশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু কোন দোকানে সন্দেশ না পাইয়া যখন কাতর হইল, তখন কোন দয়াবান্ পথপ্রদর্শক পথিকের অনুগ্রহে দোকান পাইয়া চরিতার্থ হইল। আমাদেরও মায়া দ্বারা সেই অবস্থা হইয়াছে সুতরাং সুখ খুঁজিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের দোকান ভুলিয়া নানা স্থানে সুখের অন্বেষণ করিতেছি। যখন কোথাও প্রকৃত সুখ না পাইয়া কাতর হইয়া পরম সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইব, তখনই গুরুর দর্শন লাভে চরিতার্থ হইব।

আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমরা অজ্ঞান, তাই সেই সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বীতশ্রদ্ধ হই; আজকাল কতকগুলি সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন দয়ালু, জীবহিতৈষী, সদাশয় মহাত্মা আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া এই সকল বিষয় যোগশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, তন্ন তন্ন জ্ঞাত হইয়া মানবের হিতার্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বনে ইহা প্রকাশিত হইল। এই সকল মহাত্মাগণ সদাই পরের মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর হিতের জন্য ব্যস্ত। যেখানে লোক ভীষণ বিপদগ্রস্থ হইতেছে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন।

মহাত্মাগণ, গুরুগণ সদাই আমাদের উন্নতির জন্য ব্যস্ত আছেন, সদাই আমাদের সতর্ক করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই সঙ্কেত বা বাক্য শুনিতে পাই না; সে সুরে আমাদের মন বাঁধা নাই,

তাই শুনিতে পাই না; তাই বুঝিতে পারি না। তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজে দর্শন না দিয়া, নিজ মুখে উপদেশ না দিয়া, অপরের দ্বারা অদৃশ্যে, পশ্চাতে থাকিয়া সৎপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সঙ্কেত আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি এবং বুঝিতে না পারিয়া অসৎ পথে যাইয়া বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি। আমরা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকি, ততই আমাদের এই সকল সঙ্কেত অনুভব-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার যতই আমাদের উন্নতি হয়, ততই আমাদের সূক্ষ্মদেহের অনুভূতি বা চৈতন্যশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সামান্য সামান্য বিষয়ের আঘাত দ্বারা সূক্ষ্মদেহ স্পন্দিত হইতে থাকে; কাজেই অনুভবশক্তিও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই আঘাতজনিত স্পন্দন অতি সাবধানে সহ্য করিতে হয়, অর্থাৎ উৎকণ্ঠিত না হইয়া স্থির, ধীরভাবে পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফলসকল ভোগ দ্বারা শেষ হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া সুখী হইতে হয়। যতই উন্নতির পথে যাওয়া যায়, পূর্ব্বজন্মকৃত-কর্ম্মফলসকল ততই শীঘ্র শীঘ্র আসিতে থাকে। যে সকল দুরদৃষ্টের ফল পাঁচ সাত জন্মে শেষ হইত, তখন তাহা দুই এক জন্মেই শেষ হইতে থাকে; এইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, ধার্ম্মিক ব্যক্তি নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যখন শিষ্য হইবার সৎগুণগুলি আমাদের হয়, অর্থাৎ শিষ্য হইবার উপযুক্ত হই, তখন গুরু আর স্থির থাকিতে পারেন না, নিজে আসিয়া দর্শন দিয়া চরিতার্থ করেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই আমাদের শিক্ষা করিতে হয়, এবং সদা সতর্ক থাকিয়া বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোন্‌টী কর্ত্তব্য ও কোন্‌টী অকর্ত্তব্য; কর্ত্তব্য

মধ্যে আবার কোন্‌টী বেশী কর্ত্তব্য, কোন্‌টী কম কর্ত্তব্য, এই সকল বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হয়; কারণ ভগবান বলিয়াছেন—

"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।" ১৭।৪।

কর্ম্মের গতি অতি দুজ্ঞের্য়।

মনে কর, কোন ব্যক্তি মনুষ্য হত্যা করিয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে; তুমি ঐ হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছ; পূর্ব্ব হইতে তাহার সহিত তোমার বিবাদ থাকায় যদি তুমি ক্রোধ পরবশ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড হউক—এই মনে করিয়া সত্য কথা বল, তবে তোমার পাপ হইবে; সত্য কথা বলা হইল বটে, কিন্তু দুরভিসন্ধি থাকায় হত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করিবে; সুতরাং বিশেষ ধীরভাবে স্থির চিত্তে বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়।—

এই সকল কর্ত্তব্য বিষয়কে সাধারণে ধর্ম্ম কহে।

ধর্ম্ম কাহাকে কহে?

ধৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ ধর্ম্ম; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরা; যাহা ধরিয়া মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে, বা যাহা ধরিয়া পরমাত্মা নিজের অবস্থায় আসিতে পারেন, তাহাই ধর্ম্ম। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্।"

যাহা ধরিয়া পরমাত্মা নিজ অবস্থায়—নির্ব্বিকার অবস্থায় আসিতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্মাই ঈশ্বর, তিনি জীবরূপে নব-দ্বারযুক্ত দেহে বদ্ধ হইয়াছেন; যাহা ধরিয়া—যাহা করিয়া, সেই

আত্মা বদ্ধাবস্থা ঘুচিয়া নিজ অবস্থায় আসিতে পারেন, সেই সমস্ত কার্য্যকে ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্মের লক্ষণ দশ প্রকার ;—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীঃ বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥

ধৃতি—ধারণা।—সকল প্রাণীরই দেখিবার ও শুনিবার শক্তি আছে, সকলেই কত রূপ দর্শন ও কত শব্দ শ্রবণ করিতেছে, তৎকালীন মনোমধ্যে যেভাব অঙ্কিত হয়, তাহার নাম ধারণা। মনুষ্য ভিন্ন অন্যের ইহা থাকিলেও অতি অল্প, সুতরাং এই ধারণাশক্তি মনুষ্যের নিজস্ব ধর্ম্ম।

ক্ষমা—দোষীর দোষ না দেখা বা মহত্ব হেতু উপেক্ষা করা।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিবার শক্তি সজীব ও নির্জীব সকলেরই আছে, কিন্তু প্রতিঘাত করিবার প্রবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিবার শক্তি মানবেরই আছে, সুতরাং ক্ষমা মনুষ্য-ধর্ম্ম।

দম—কর্ম্ম-সংযম।—ক্ষুৎপিপাসা ও ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে মনের বিকার প্রাণীমাত্রেরই আছে, কিন্তু ইহা দমন করিবার শক্তি মানবেরই আছে, অন্যের নাই ; সুতরাং এই দম বা সংযম মনুষ্য-ধর্ম্ম ; ইহা অন্তরের সহিত করিতে হইবে, জোর করিয়া কার্য্য বন্ধ করিলে হইবে না।

অস্তেয়—অচৌর্য্য।—চুরি না করা ; লোভের বশীভূত হইয়া অন্যায়রূপে অন্যের বস্তু লইবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে, কিন্তু এই চুরি-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার শক্তি মানবের নিজস্ব ; সুতরাং ইহা মনুষ্য-ধর্ম্ম। পাতঞ্জল দর্শনে আছে ;—

"অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।"

চুরি-প্রবৃত্তি একেবারে হৃদয়ের সহিত ভুলিতে হইবে। চুরি করিব না বলিলে, বা চুরি না করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই অস্তেয় মনে মনে প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহার নিকট সর্ব্বরত্ন উপস্থিত হয় বা সকল রত্ন প্রাপ্তির তৃপ্তি লাভ হয়।

শৌচ—শুদ্ধতা।—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ থাকা।

"শৌচাৎ সাঙ্গ জুগুপ্সা পরৈর সঙ্গশ্চ।" পাতঞ্জল।

মলিনতা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতি বা স্বভাবসিদ্ধ; তাই আমরা শুচি থাকিতে ভালবাসি; এই শৌচ দুই প্রকার; বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক্। বাহ্যিক শৌচ করিতে করিতে আভ্যন্তরিক শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন জুগুপ্সা অর্থাৎ শরীরের প্রতি ঘৃণা আসে, শরীরের প্রতি আদর থাকে না, যত্ন থাকে না; সুতরাং মরণেও ভয় থাকে না, এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি হওয়ায় যোগসাধন সুগম হয়।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বশীভূত করা।—প্রাণীমাত্রেরই এই দশপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আসক্তি হইতে নিবৃত্তি হইবার যে শক্তি, তাহা মনুষ্যেরই আছে; সুতরাং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-শক্তি মনুষ্যের ধর্ম্ম; ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাধিতে পারিলে সন্তোষ আপনা আপনি আসিয়া থাকে।

"সন্তোষোদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।" পাতঞ্জল।

সন্তোষ সিদ্ধ হইলেই সদানন্দাবস্থা আইসে, অর্থাৎ উপমা-রহিত আনন্দ সদাই মনে বর্ত্তমান থাকে।

ধীঃ—বুদ্ধি।—হিতাহিত বোধ, ভালমন্দ জ্ঞান, নিত্য ও অনিত্য বস্তুর জ্ঞান; বস্তু সকলের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বা পরীক্ষা করিয়া

তন্মধ্যে কোন্‌টী নিত্য বা কোন্‌টী অনিত্য স্থির করা, কিম্বা শাস্ত্র-নিরূপিত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিবার শক্তি কেবল মানুষেরই আছে; সুতরাং ধীশক্তি মনুষ্য-ধর্ম্ম।

বিদ্যা।—বিদ্‌ধাতু অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞান অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান নহে, লেখাপড়া নহে, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান। যদিও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিরূপ দেহজ্ঞান হয়ত কোন কোন জীবেব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, মনুষ্য ভিন্ন অন্য কাহারও নাই; সুতরাং এই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ মনুষ্য-ধর্ম্ম। চৈতন্য-রূপী পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়গণ ও দেহ হইতে যে পৃথক এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান; ইহারই অন্য নাম বিদ্যা।

সত্য।—মিথ্যা ভুলিয়া যাওয়া, কেবল মিথ্যা কহিব না বলিলে হইবে না; মিথ্যাকে একেবারে ভুলিতে হইবে। প্রকৃত সত্য আচবণ করা সাত্ত্বিকগুণেরই একটী ভাব বা স্বভাব, সুতরাং ইহা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। এই গুণ শরীরে বৃদ্ধি করিবার জন্য সাত্ত্বিক ভোজী হওয়া চাই।

ভগবান বলিয়াছেন—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকা প্রিয়াঃ॥

১৭।৮। গীতা।

আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচিবৃদ্ধিকর, রস ও স্নেহযুক্ত, চিত্ত-তুষ্টিকর আহার সাত্ত্বিকগণেব প্রিয়; এই আহারে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলাশ্রয়ত্বম্। পাতঞ্জল।

সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা হইলে, অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ফল নিজের অধীন হয়, এবং বাক্‌সিদ্ধ হয়।

অক্রোধ।—ক্রোধ না থাকা, রাগ মন হইতে দূর করা, ক্রোধ উন্নতি-পথের কণ্টক।

এই দশটী মানবের আছে বলিয়াই, অন্য জীব হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; ইহা সকলেরই থাকিলেও আবার যিনি ইহাদের সাধনা করিয়া উত্তেজিত, উন্নত, সবল, সতেজ করিতে পারিয়াছেন, তিনি মহাত্মা। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুগণ এই দশটী ধর্ম্ম লক্ষণের বিরোধী। যেখানে কাম, ক্রোধ আদি রিপুগণ প্রবল, সেইখানেই ধর্ম্মলক্ষণ ম্লান, ক্ষীণভাবাপন্ন; আর যেখানে ধর্ম্মলক্ষণ-গুলি প্রবল, সেখানে রিপুগণ নিস্তেজ; সুতরাং যেখানেই কাম, ক্রোধ আদি পশুধর্ম্ম প্রবল, সেইখানেই মনুষ্য-ধর্ম্ম নিস্তেজ ক্ষীণ বা লোপ, সুতরাং যাহার ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে সেই মনুষ্য; আর যাহার পশুধর্ম্ম প্রবল, তাহার মনুষ্যত্ব নাই, মানবাকৃতি হইলেও সে পশুর মধ্যে গণ্য।

ইহার অনুপাতানুসারে ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের উদয়, আর অধর্ম্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুত্ব প্রাপ্তি হইতে থাকে।

অতএব ধর্ম্মাচরণ মনুষ্যত্বের হেতু, উন্নতির হেতু, কারণ তাহা হইলেই মনুষ্য, মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইবে। হারিতঃ বলিয়াছেন;—

ধর্ম্মশ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয় লক্ষণং।

যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ, আর যাহার দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের হানিতে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়; অধর্ম্মের দ্বারা মানুষের

মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া ক্রমশঃ পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অধোগামী হইতে, পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিও না। এই ধর্ম্মলক্ষণ দশটীকে বিশেষ যত্নসহকারে অভ্যাস করিতে হইবে ; কারণ এই দশটী ধর্ম্ম-লক্ষণই সাধন-পথের সম্বল ; এইগুলি সাধনা হইলে তবে সাধন-পথেব পথিক হওয়া যায়—শিষ্য হইবাব জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। এই ধর্ম্মেব পথ তিনটি ; প্রত্যেক সাধককে এই তিন পথেব কোন না কোন পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। যিনি যে পথ সুবিধা বোধ করেন, তিনি সেই পথেই যাইতে আবম্ভ কবেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেই আর পথ পৃথক্ থাকে না—স্বতন্ত্র থাকে না—একত্র হইয়া যায় ; তখন আব কেহ কাহাকে বিভিন্ন পথাবলম্বী দেখেন না ; তখন সকলেই এক উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, পবস্পর সাহায্য পাইয়া যাইতে থাকেন ; তখন আব হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি পৃথক জ্ঞান থাকে না, ভেদভাব থাকে না, দ্বেষভাব থাকে না, অনৈক্যতা থাকে না। এই সময় তাঁহাদেব অনেক কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে, পৃথিবীর অনেক কার্য্য তাঁহাদেব কবিবাব ভাব পড়ে। যাউক, এক্ষণে সেই তিনটি পথ কি, তাহাই দেখা যাউক।

কর্ম্ম ১ম। জ্ঞান ২য়। ভক্তি ৩য়।

এই সকল পথকে মার্গ এবং যোগও কহে।

১ম। কর্ম্মমার্গ বা কর্ম্মযোগ।

২য়। জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ।

৩য়। ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ।

এক্ষণে এই তিনটি পথ কিরূপ ; তাহাই সংক্ষেপে সাধ্যমত বলিব। ধার্ম্মিক মহোদয়গণ নিজগুণে, নিজের মহত্বের জন্য আমার

ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া লইবেন, এবং আমাকে জানাইলে বাবান্তবে সংশোধন করিয়া দিব।

এই তিন পথাবলম্বীকেই প্রাণপণে অভ্যাস করিতে হয়; অতএব অভ্যাস এই তিন পথাবলম্বীরই অবলম্বন জানিবে।

১ম। কর্ম্মযোগ।

যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম তিন প্রকার;—১। বৈধ-কর্ম্ম বা কর্ম্ম। ২। বিকর্ম্ম। ৩। অকর্ম্ম।

কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যতদিন সংস্কার থাকিবে, একেবারে সংস্কারের লোপ না হইবে, ততদিন কর্ম্ম করিতেই হইবে। ভগবান বলিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

৫ম। ৩য়। গীতা।

কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজ গুণসকল সকলকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।

বেদে যে কর্ম্মের বিধি আছে, তাহাই বৈধ-কর্ম্ম বা কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম কামনার সহিত করিলে শুভাদৃষ্ট হইয়া স্বর্গাদি ভোগ হইয়া থাকে। বৈধ-কর্ম্ম, যথা—ঋষি-ঋণ শোধ জন্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি, পিতৃ-ঋণ শোধ জন্য সংসারী হইয়া পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি এবং দেব-ঋণ শোধ জন্য যজ্ঞাদি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

১৩শ। ৩য়। গীতা।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন সকলপাপ হইতে মুক্ত করে, আর যে নিজের জন্য পাক করে, সে দুরাচার পাপই ভোজন করে। বিহিত কর্ম্ম না করা বিকর্ম্ম, আর যে কর্ম্মের নিষেধ আছে, তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অকর্ম্ম।

এই শেষ দুই প্রকার কর্ম্ম করিলে দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়; আর বৈধ-কর্ম্ম সকাম হইলে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন করে; শুভাদৃষ্ট দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও স্বর্গাদি ভোগ হয়, পরে আবার জন্ম হয়। কামনাযুক্ত সৎকর্ম্ম দ্বারাও বন্ধন অনিবার্য্য। ভগবান বলিয়াছেন—সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী; কারণ তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্ম্ম করিবে, অথচ ফলভোগ করিবে না; এই হইলেই জীব ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

৪৭। ২য়। গীতা।

নিষ্কাম কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন না হয়, কর্ম্মফল হেতু হইও না; সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়। যদি আসক্তি ত্যাগ সহ কর্ম্ম করিতে পারা যায়, তবেই সুখ দুঃখ ভোগ হইবে না, এবং নূতন সংস্কারও হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে না। আমাদের দুঃখভোগে যেমন দ্বেষ আছে, যোগিগণ সুখ ভোগকেও তদ্রূপ দুঃখভোগ মনে করেন।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। পাতঞ্জল।

দুঃখের অনুবৃত্তির নাম দ্বেষ। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্র দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা বা অনিচ্ছা হয়; ইহার অন্য নাম দ্বেষ। আমরা যে সকলকে সুখকর মনে করি, তাহা প্রকৃত সুখকর নহে, আমরা ভ্রমবুদ্ধিতে অনিত্য বস্তুকে নিত্য বোধে সুখকর মনে করি, প্রকৃত তাহাও দুঃখের জনক।

যাহা করিতেছি, তাহা ঈশ্বর করাইতেছেন; তাঁহার জন্য করিতেছি, তৎফল সমস্তই তাঁহারই; তৎসহ নিজের কোন সম্পর্ক নাই, যদি এরূপ মনে করিতে পারি, বিশ্বাস করিতে পারি, কর্ম্মে সফল বা বিফলকাম হইলেও মনের কোন ভাব উদয় না হয়, তবেই কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইব না; তবেই নূতন সংস্কারও আর উৎপন্ন হইয়া কর্ম্মের হেতু বা কারণ হইবে না; ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞান ও ভক্তি হইতে থাকে। ভক্তি জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত; আবার ভক্তি হইতে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ।

যতদিন সংস্কার সকল বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন শান্তি নাই এবং কর্ম্মও করিতেই হইবে; নিষ্কাম কর্ম্ম করিব বলিলেই হইবে না; পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লইয়া এজন্মে প্রাণপণে ঐ প্রকার কর্ম্ম করিতে থাকিলে ভক্তিভাবে গুরু-উপদেশ মত কর্ম্ম করিতে করিতে নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার হয়। তাই বলিয়াছি, ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ।

যাহার যেমন প্রবৃত্তি, যেমন প্রকৃতি, গুরু তাহাকে তেমনিভাবে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। সেই গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিতে চলিতে ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি মনের আবর্জ্জনা সকল দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই

প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়; সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি কাহাকেই উপেক্ষা করিবার যো নাই।

সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কামনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কত যাতনা, কত কষ্ট, কত দুঃখ ভোগ করিয়া অসহ্য বেদনায় অস্থির হইতেছি; তবুও কামনাগুলিকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না বা ইচ্ছা থাকিলেও পারি না; আবার নূতন নূতন কামনাকে মনোমধ্যে উৎপন্ন করিতেছি। গুরু সদাসর্ব্বদা কত প্রকারে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহার সেই মধুমাখা কথা শুনিতে পাই না; সে সুরে কাণ বাঁধা নাই, তাই শুনিতে পাই না। তাঁহার সঙ্কেত দেখিবার চক্ষু নাই, তাই দেখিতে পাই না; শুনিবার জন্য, দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলেও, দুষ্ট-কামনা তাহা শুনিতে বা দেখিতে দেয় না; তখন সেই আগ্রহ, সেই যত্ন, সেই চেষ্টা শিথিল হইয়া পড়ে; আর কালকামনা সুযোগ পাইয়া টানিয়া লইয়া বহুদূরে লইয়া যায়। ওঃ কি ভয়ঙ্কর! এমন শত্রু আর জগতে নাই!!

এই স্থলে দুটী গল্প বলিতে হইল,—সুগ্রীব রাজা হইয়া সীতা উদ্ধারের কথা ভুলিয়াছিলেন; মহাত্মা লক্ষ্মণ যখন সীতা উদ্ধারের কথা স্মরণ করিয়া দিয়া তিরস্কার করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, প্রভো! আমি সমস্তই জানি, মধ্যে মধ্যে মনেও করি, কিন্তু বানুরে বুদ্ধি আমাকে করিতে দেয় না; আমি মনে করি যে, বানুরে বুদ্ধি ত্যাগ করি, কিন্তু বানুরে বুদ্ধি আমাকে ছাড়ে না। যতক্ষণ লক্ষ্মণরূপী গুরুর সাক্ষাৎ না হইবে, যতক্ষণ সংস্কারের বীজ পর্য্যন্ত নিঃশেষে নির্ম্মূল না হইবে, সে পর্য্যন্ত সীতা উদ্ধারও হইবে না, ৺আত্মারামের দর্শনও হইবে না।

স্রোতের জলে একটা ভল্লুক ভাসিয়া যাইতেছিল, জনৈক পথিক সেই ভল্লুককে কম্বল-ভ্রমে জলে নামিয়া ধরিল, বিপন্ন ভল্লুক প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে অবলম্বন করায়, সে জলমগ্ন হইতে লাগিল, তীরস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে কম্বল ছাড়িবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করায়, সে উত্তর করিল, ভাই হে! কম্বল ত আমি ছাড়িয়াছি; কিন্তু কম্বল ত আমাকে ছাড়ে না; তদ্রূপ আমাদের সেই দুষ্টকামনা আমাদের ছাড়ে না, সুতরাং ইহাকে ছাড়াইতে বহু আয়াসের প্রয়োজন।

যদি কেহ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শিখিয়া থাকেন, যদি কেহ কামনাকে বধ করিতে শিখিয়া থাকেন, যদি কেহ কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধিতে মনকে অবিচলিত রাখিতে শিখিয়া থাকেন, তবে তিনিই কর্ম্ম করিয়াও নিষ্কর্ম্মী, তিনিই প্রকৃত ভক্তির পাত্র, তিনিই জ্ঞানী; জ্ঞানীব্যক্তির যেরূপ মুক্তি হয়, নিষ্কাম কর্ম্মীরও তদ্রূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কর্ম্মত্যাগীর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সাধনপথের পথিক।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার;—১। কর্ম্মেন্দ্রিয়, ২। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার;—১। বাক্, ২। পাণী, ৩। পাদ, ৪। পায়ু, ৫। উপস্থ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার;—১। চক্ষু, ২। কর্ণ, ৩। নাসিকা, ৪। জিহ্বা, ৫। ত্বক্। আবার ইহাদের তন্মাত্র পাঁচটি। আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটি অন্তরেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া অর্থাৎ সকল জীবের হিতে রত থাকিয়া, কর্ম্মের ফলত্যাগ দ্বারা কর্ম্ম করিলে,

সেই কর্ম্ম কখনই বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কর্ম্মের কারণ হয় না, বরং জ্ঞান ও মুক্তির হেতু হয়। ভগবান (৫৬) গীতায় বলিয়াছেন,—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু। কেহ কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহে যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বন্ধু, আর যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে নিজেই নিজের শত্রু, অতএব আত্মদ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধে রাখিবে অধঃপতিত করিবে না।

নিজের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে জগতের উন্নতি করিতে হইবে, অন্যথায় নিজের উন্নতির আশা নাই। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, -

মৎকর্ম্মকৃৎমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫।১১॥

যে ব্যক্তি আমাকে পরম-পুরুষার্থ জানিয়া, আমাতে ভক্তি পূর্ব্বক আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী হন, তিনিই আমাকে পান।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—১। তাঁহার কর্ম্ম কি? ২। কিরূপে তৎপরায়ণ হওয়া যায়? ৩। কি প্রকারে তাঁহাতে ভক্তিমান্ হওয়া যায়? ৪। সঙ্গবর্জ্জিত কাহাকে কহে? ৫। সর্ব্বজীবে নির্ব্বৈরতাই বা কি?

১। তাঁহার কর্ম্ম—সৃষ্টির পালন। কি প্রকারে তাঁহার

সেই পালন-কার্য্যের সহায়তা করা যায়? কেহ কেহ বলিবেন, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমাদের দ্বারা তাঁহার পালন-কার্য্যের কি সহায়তা হইবে? ইহা ভ্রম; কারণ তিনি কিছুই করেন না, সমস্তই তাঁহার শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া অন্যের দ্বারা হইয়া থাকে। যেমন রাজকার্য্যের কোন কাজই রাজা নিজ হস্তে করেন না, তাঁহার নিয়োজিত নিয়ম দ্বারা লাট, ছোটলাট, কমিশনার, জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি কর্ম্মচারী দ্বারা হইয়া থাকে, তাঁহার কার্য্যেরও এইরূপ বন্দোবস্ত—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবতা, মহাত্মা, ঋষি ও মনুষ্য দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার আভাস রামায়ণে আছে। ক্ষুদ্রপ্রাণী কাষ্ঠবিড়াল দ্বারাও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বৃহৎ সমুদ্র-বন্ধনের সাহায্য হইয়াছিল। বৃক্ষগণ পাতা দিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে জীবের দূষিত ত্যাজ্য বিষ (কার্ব্বনিক্ এসিড বাষ্প) গ্রহণ করিয়া নিজেদের কাষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। যদি একটা বৃহৎ বৃক্ষের একটি ডালে, একটি পাতায় বা একটি মূলে জলসেচন করা যায়, তবে সেই বৃহৎ বৃক্ষের কি একটুও সাহায্য করা হয় না? একটি পাতার, একটি মূলের সাহায্য করিলে সেই বৃক্ষের কিছু না কিছু কাষ্ঠ উপাদান সংগ্রহের সাহায্য করা হইয়া থাকে। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জীবসমষ্টিই ঈশ্বর। একটি জীবের সেবায় ঈশ্বরের সেবা কেন না হইবে? কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ—
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ২।১ ॥

সমস্ত জীব একমাত্র তিনিই বিভিন্নরূপে প্রকাশমান। যেমন বৃহৎ অগ্নিরাশির অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর বিবিধ আকারে জীবরূপে প্রকাশমান। মুণ্ডকোপনিষদে আছে,—

ব্রহ্ম বেদমমৃতম্ পুরস্তাৎ
ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং
ব্রহ্ম বেদম্ বিশ্বরূপম্ বরিষ্ঠম্ ॥ ২।১১ ॥

অর্থাৎ বেদস্বরূপ ব্রহ্ম সম্মুখে (পূর্ব্বে) পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধঃ ও উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া বিশ্বরূপে প্রকাশমান্। যেমন স্বর্ণ হইতে জাতদ্রব্য মাত্র চিরকাল স্বর্ণই থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জায়মান জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। বালা অনন্ত আদি গলাইলে যেমন স্বর্ণ হয়, তদ্রূপ প্রলীনকালে এ সমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্মে লীন হইবে। লয়কালে সমস্তই সেই পরাৎপরে বিলীন হইবে, আর অন্য গতি নাই, অন্য স্থান নাই, মহাত্মা হইতে মহাপাপী পর্য্যন্ত তাঁহাতেই যাইবে, কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই তাঁহাকে পাইবেন। সমস্ত দৃশ্যবস্তুতে, সমস্ত চরাচরে তাঁহাকে দেখিতে শিখিলে, অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে তাঁহাকে সর্ব্বময় দেখিতে শিখিলেই ভক্তিমান্ হওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমরা ঈশ্বরের অংশ বা তাঁহার কণামাত্র এবং যতক্ষণ তাঁহাতে পৌঁছিতে না পারিব, ততক্ষণ গত্যন্তর নাই, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর আত্মা বা ঈশ্বর বর্ত্তমান, কিন্তু আমরা আমাদের স্বকীয় অবস্থা ভুলিয়া ভ্রমজ্ঞানে কষ্টভোগ করিতেছি।

কোন সময় কোন কাঠুরিয়ার স্ত্রী বনে কাঠ ভাঙ্গিতে গিয়া এক বন্যসিংহী কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহার এক শিশুসন্তান কাপড়ের দ্বারা পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল, সেই শিশুও সিংহের কবলস্থ হয়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সিংহ দয়াপরবশ হইয়া নিজের শাবকদের সঙ্গে তাহাকেও প্রতিপালন করে; কাঠুরিয়া-শিশু সিংহশাবকের সঙ্গে সিংহের স্তনপান করিত; সিংহ তাহাকে নিজ শাবকের ন্যায় জ্ঞান করিত; শাবকদের যাহা খাইতে দিত, তাহাকেও তাহাই খাইতে দিত। এইরূপে সে বহুকাল সিংহের গুহায় প্রতিপালিত হইল; পরে কোন প্রকারে সেই বালক মনুষ্যের হস্তগত হইল। বহুকাল সিংহের স্তনপান করা ও সিংহের নিকট প্রতিপালিত হওয়ায়, সে নিজেকে সিংহ-শাবক বা সিংহ বলিয়া ধারণা ও বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহার স্বভাব ও রুচি অনেকটা সিংহের মত ছিল; আম মাংসে রুচি ছিল, মনুষ্য দেখিয়া ভীত হইত, জনসমাজে থাকিতে ভালবাসিত না বা পারিত না। ইহার হাত, পা, মুখমণ্ডল মানুষের মত হইলেও একটা বিকটাকার জন্তু বা বন-মানুষ বলিয়া হঠাৎ প্রতীতি হইত। ঊর্দ্ধচোয়ালের হাড় (সুপিরিয়র-ম্যাক্জিলারি) বৃহৎ, হৃষ্টপুষ্ট, মুখের হা বড়, মুখমণ্ডল ও কপালের মাংসগুলি বৃদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত,

মস্তকের দিক হইতে কপালের অনেক নিম্ন পর্য্যন্ত চুল, চুলগুলি কটা; চক্ষু গোলাকার; দৃষ্টি এক নূতন প্রকার, মাথা হেট করিয়া চক্ষু কপালের দিকে তুলিয়া দেখিত। সদাই যেন ত্রস্ত, ব্যস্ত, ভীত। সময় সময় অর্থশূন্য এক একটা শব্দ করিত। তাহার মনে ধারণা যে, সে সিংহ। ক্রমে ক্রমে তাহাকে কথা শিখান হইয়াছিল। অনেক প্রকারে বুঝাইয়াও তাহাকে মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করাইতে পারা যায় নাই। নিজে অনেক তর্ক বিতর্কের পর নিজেকে মনুষ্য বলিয়া স্থির করিত, কিন্তু আবার ভুলিয়া গিয়া নিজেকে সিংহ বা সিংহ শাবক বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত; এবং সেইরূপ আচরণও করিত। এইরূপ বহুদিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা আমি মানুষ, আমি মানুষ, ইত্যাকার ভাবিতে ভাবিতে যখন সে নিজেকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল বা বিশ্বাস হইল, তখন সে অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিয়াছিল। তদ্রূপ আমরা যে "ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বর" হই, আমাদের বিপরীত বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না। আমার প্রকৃত আমিত্ব জ্ঞান না হয়, প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান না হইয়া, অন্য একটি ভ্রমজ্ঞানের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি। ইহাকেই পতঞ্জলি বিপর্য্যয় জ্ঞান বলিয়াছেন—

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম তদ্রূপ প্রতিষ্ঠিতম্।

পাতঞ্জল।

যে জ্ঞান ঠিক স্বরূপে স্থায়ী হয় না, অর্থাৎ যে জ্ঞান মিথ্যা তাহাকে বিপর্য্যয় জ্ঞান কহে। আমাদের যে "আমি জ্ঞান"

ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই মিথ্যা জ্ঞান, এই বিপর্য্যয় জ্ঞান ঘুচিয়া যখন "আমিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই আমি" এই আত্মজ্ঞান হইবে, তখনই আমাদের সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া নির্ব্বিকাররূপে স্বরূপে, অবস্থিতি হইবে, অর্থাৎ জন্মমৃত্যু রহিত হইবে, ইহাই আমাদের শেষ গতি, ইহাই আমাদের শেষ ফল!

অদৃশ্য কীটাণুকীট হইতে বৃহদাকার জীব, ক্ষুদ্র শৈবাল হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, এই অদৃশ্য ধূলিকণা হইতে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে, সমস্তই তাঁহার অংশমাত্র। ধূলিকণা হইতে ব্রহ্মাণ্ড, যাহার অন্ত নাই, সীমা নাই, আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে যাহার ধারণা হয় না, এ সমস্তই তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নহে; এই জ্ঞান দৃঢ় হইলেই তৎপরায়ণ হওয়া যায়

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, আমাদের চিন্তাশক্তির আকার আছে, বর্ণ আছে, চিন্তা করিবামাত্র তাহা কোন সূক্ষ্ম পদার্থে নীত হইয়া ক্রমে ক্রমে দূরস্থ হইতে থাকে। যে দ্রব্য যত স্থূল, তাহা বহন করিতে স্থূল যানের প্রয়োজন; সূক্ষ্ম বস্তু বহনের যানও সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা হইয়া থাকে। শব্দ সূক্ষ্মবস্তু, তাহার বহনকর্ত্তা সূক্ষ্মবায়ুমণ্ডল। আলো আবার শব্দ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার বহনকর্ত্তা বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইথর। চিন্তা আবার আলো অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সুতরাং ইথর অপেক্ষাও কোন সূক্ষ্ম বস্তুর দ্বারা বাহিত হয়। আবার যে বস্তু যত স্থূল, তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে অধিক সময় লাগে। শব্দাপেক্ষা আলো সূক্ষ্ম বলিয়া আলো শীঘ্র বাহিত হয়।

মনের চিন্তা আবার তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, বাহক ইথর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহার গতি আরও শীঘ্র। যাঁহারা পৃথিবীর আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তাস্রোত আজও ব্রহ্মাণ্ডের শেষসীমায় পৌঁছায় নাই। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !!!

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য্য, পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড়, অনেক দূরে থাকার জন্য আমরা এত ছোট দেখি! এতদূর হইতে সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে আসিতে কেবলমাত্র ৭ মিনিট লাগে; অনেক নক্ষত্র এতদূরে আছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত সেই সকল নক্ষত্রের আলো আজও পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে নাই। তবে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড !!! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার উপকার !!! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা সেই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিকর্ত্তার উপকার !!! কি অদ্ভুত কথা !!! অদ্ভুত নহে। তাঁহার উপকার নহে, আমার নিজের উপকার; আমি তাঁহার, তাই তাঁহার কার্য্যে যোগদান আমার নিজের কার্য্য।

বিজ্ঞানাবিদ্‌ পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের একটি অঙ্গুলিতে যে পরিমাণ রক্ত আছে, সেই রক্তটুকুর মধ্যে সাত হাজার শত জীব আছে; এক্ষণে আমার সমস্ত শরীর কত জীবের সমষ্টি ভাবিয়া দেখ! ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমার শরীর ক্ষুদ্র ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, আবার আমার দেহস্থ একটি জীবের তুলনায় আমার শরীর প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-সদৃশ। একটি মানবের সেবা করিলে সেই দেহস্থ কত জীবের সেবা করা হয়; একটি মানবকে বাঁচাইতে পারিলে কত

জীবের প্রাণদান করা হয়। একটি মানুষকে খাইতে দিলে কত অসংখ্য জীবের আহার যোগান হয়। যিনি একটি মানুষকে খাইতে দেন, তিনিও বহুপালক। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছিলেন- ভীম! দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিও না। দুর্য্যোধন বহুপালক, তাহার মস্তক উৎকৃষ্টতম ঐশীশক্তিযুক্ত তাই বলি, যদি নিজ উন্নতির ইচ্ছা থাকে, যদি নিজ উন্নতির চেষ্টা থাকে, তবে প্রাণপণে পরোপকার কর। নিঃস্বার্থভাবে জীবের, পরের সেবা কর একটি জীবের, একটি মানুষের সেবা করিলেও সেই পরমপুরুষেরই সেবা করা হইবে। তখন তিনিই আমাদের অপেক্ষা উন্নত মনুষ্যদ্বারা, আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন, উন্নত করিয়া দিবেন, অসীমবলে বলীয়ান করিয়া দিবেন। যদি তখন সেই নিজ উন্নতির প্রতি না তাকাইয়া—সেই উন্নতি, সেই বল, পরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে পারি, তবে তিনি কোলে তুলিয়া লইবেন। যেমন সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত মাতা ক্রন্দনশীল শিশুকে খেলার দ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া নিজ গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হন কিন্তু যদি সেই শিশু সেই প্রাপ্ত খেলনা না লইয়া কাঁদিতে থাকে, তবে মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লন, সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত-ঐশ্বর্য্য যদি পরের জন্য ব্যয় করিয়া অবোধ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতে পারি, তবেই সেই কোল পাইব। পার্থিব প্রলোভনে না ভুলিয়া সততপরতঃ পরের মঙ্গল প্রার্থনা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পরের মঙ্গল করা, সর্ব্ব জীবের উপর দয়া, সকলের উপর প্রেম বিতরণই—সেই কোল পাইবার প্রথম পথ, প্রথম সোপান বা প্রশস্ত উপায়।

মনুষ্যমাত্রেরই তপস্যানিরত থাকা উচিত। তপস্যা শব্দ শুনলেই হয় ত অনেকে চমকিয়া বিরক্তভাবে মনে করিবেন, আমরা গৃহী, আমরা কি তপস্বী যে, তপস্যা করিতে বনে যাইব! তপস্যার জন্য বনে যাইতে হয় না এবং গৃহীকেও তপঃনিরত থাকিতে আছে বা থাকা যায়, ইহা একটা আকাশকুসুম কথা নহে, ভগবান গীতাতে তপঃ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। যথা—

১। শারীরিক, ২। মানসিক, ৩। বাচনিক।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪।১৭ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই কয়েকটী শারীরিক তপঃ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥

১৫।১৭। গীতা।

প্রিয়হিত সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস এই কয়েকটী বাচনিক তপঃ।

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥

১৬।১৭ গীতা।

মন প্রসাদ, সৌমত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়েকটী মানস তপঃ, ইহা গৃহীর করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য এবং চেষ্টা করিলে অসাধ্য নহে। এই কয়েকটী মানস

তপঃ; অথবা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে তপঃ ত্রিবিধ

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে॥

১৭.১৭। গীতা

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা সাত্বিক তপঃ।

সৎকার মানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈবযৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥

১৮।১৭। গীতা।

সৎকার, মান ও পূজার্থ দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম রাজসিক তপঃ। ইহা অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥

১৯।১৭। গীতা।

পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহ বশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহা তামসিক তপঃ নামে কথিত হয়।

বেদান্তমতে—তপঃ ঈশ্বরের বিভূতিবিশেষ। অগ্নিতে ধাতু মলাদির ন্যায় ঈশ্বর প্রণিধানে মনের পাপাদি মলভার দগ্ধ হইয়া যায়; তজ্জন্যই ইহার নাম তপঃ হইয়াছে।

মরীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গ সাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণাদির কৃত চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র ব্রতের নাম তপঃ।

তপঃ পরং কৃতযুগে, ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥

সুতরাং আমাদের যথাসাধ্য দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য. কিন্তু এই দান কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্যই করিতে হইবে. নিজের ফলের প্রতি লক্ষ্য যেন না থাকে। সেই দান আমাদের বন্ধনের হেতু হইবে না।

গীতায় (২০।১৭) ভগবান দান তিনপ্রকার বলিয়াছেন,—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

উপকারের আশা না রাখিয়া, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

২১।১। গীতা।

যাহা প্রত্যুপকার পাইবার আশায় কিম্বা ফলোদ্দেশে কষ্টের সহিত দান করা যায়, তাহা রাজসিক দান নামে কথিত হয়।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২।১৭ গী॥

দেশ কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহাকে তামস দান কহে। ইহা অতিশয় কুৎসিত ও নিকৃষ্ট।

পরোপকারই আমাদের উন্নতির একমাত্র পথ। ইহাই তাঁহার কার্য্যে যোগদান। মহাত্মাগণ, গুরুগণ, নিজের মুক্তি ত্যাগ করিয়া, জগতের হিতের জন্য, জীবের মুক্তির জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক আছেন; সদাই ডাকিতেছেন, এসো ভাই এসো, এসো বাবা এসো; আর কষ্ট পাইও না। আমরা শুনিতে পাই না; আমরা পাপী, সে সুরে মন বাঁধা নাই, সে সুরে শ্রবণশক্তি বাঁধা নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই এত অবনতি। গুরুর অভাব নাই, কিন্তু শিষ্য নাই। অনেকে বলেন, গুরু পাই না; তাঁহারা নিজে কিছু করিতে পারিবেন না, গুরু সমস্ত করিয়া দিবেন, ধর্ম্ম, যোগ, মুক্তি, গুরু আসিয়া তাঁহার কমণ্ডলু হইতে বাহির করিয়া ঢক্ করিয়া গিলাইয়া দিবেন। গুরু পথপ্রদর্শকমাত্র, পথ দেখাইবেন, নিজেকে পথ পরিষ্কার করিতে হইবে এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার উপদেশ মত চলিতে হইবে। কর্ম্ম, অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তিতে নিপুণ হইলে, তবে শিষ্য হইবার উপযুক্ত হয়, অন্যথায় অজ্ঞান শিশুর হস্তে দুই পাশ ধারাল- দুই মুখ সুঁচাল অস্ত্র দিলে শিশুর যে দশা হয়, অনুপযুক্তকে দীক্ষা দিলেও তাহার ঠিক সেই দশা হয় এবং তজ্জন্য গুরুরও প্রত্যবায় আছে। তাই দয়া করিয়া গুরুগণ আমাদের তাহা দেন না। উপযুক্ত হইলে শিষ্যকে গুরু খুঁজিয়া লইতে হয় না; গুরুই শিষ্য খুঁজিয়া লয়েন, ডাকিয়া লয়েন, আনন্দের সহিত দেখা দেন, কোলে তুলিয়া লন; এবং উপযুক্ত হইলেই অদ্ভুত ক্ষমতা সকল দিয়া থাকেন বা সেই সকল ক্ষমতা পাইবার উপায় বলিয়া দেন। তাই তুলসিদাস বলিয়াছেন,—

গুরু মিলে বহুৎ বহুৎ।
চেলা মিলে না এক॥

গুরুগণ মহাত্মাগণ নিজের হস্তস্থিত মুক্তি ত্যাগ করিয়া নিজেদের সুখ ত্যাগ করিয়া, মুক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল, ব্যস্ত; আর আমরা নিশ্চিন্তভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে কতকগুলি দুরদৃষ্ট প্রস্তুত করিতেছি। নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসিয়া আবার কতকগুলি কর্ম্ম প্রস্তুত করিতেছি। একটি আগাছার মূল উৎপাটন করিতে আসিয়া কত অসংখ্য আগাছার বীজ ছড়াইয়া ফেলিতেছি। ভাবিলাম না যে, জীবন কতক্ষণ, কি করিতেছি, কাহার জন্য করিতেছি, এখনি মরিতে হইবে, এখনি কামলোকে যাইতে হইবে, দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে; যাহা করিতেছি, তাহাই সহ্য করিতে হইবে; যে চক্ষে যাহাকে দেখিতেছি, সেইরূপে অপরের দৃশ্যপথে আসিতে হইবে; আবার জন্ম হইবে, আবার কর্ম্মফল সকল ভোগ করিতে হইবে, যেরূপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিতেছি, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একবার ভাবি না, একবার মনেও করি না, মনে হইলে মুখ ফিরাইয়া লই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, দুরদৃষ্টের ফল দুঃখভোগ, আর বৈধকর্ম্মে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার ফল সুখভোগ, অতএব বৈধকর্ম্ম করিলে সুখভোগ জন্য স্বর্গবাস, তৎপরে পুনর্জ্জন্ম অনিবার্য্য, কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মীর কর্ম্মফল দগ্ধবীজবৎ অর্থাৎ ভাজাবীজের যেমন অঙ্কুর উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য

কর্ম্ম বা কর্ম্মফল তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। পাতঞ্জলে আছে,—"দগ্ধ বীজ বচ্চেৎ।"

অর্থাৎ তাহার কর্ম্মফল দগ্ধবীজের ন্যায় থাকে মাত্র; সুতরাং কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২।১২॥

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ত্যাগ হইতে শান্তি হইয়া থাকে। যাঁহার কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনি কর্ম্মী হইলেও প্রকৃত সন্ন্যাসী ও নিষ্ক্রিয়, কারণ তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এই ত্যাগ মুখে শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু বলিলেই হইবে না—আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে হইবে। এটি আমাদের মুখের কথা নহে—প্রাণের সহিত, অন্তরের সহিত, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে করিতে হইবে। হাড়ে হাড়ে প্রত্যেক বিষয়ের ফলত্যাগী হইতে হইবে। শ্রুতি-প্রতিপাদিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল—স্বর্গাদি বাস, এমন কি, মোক্ষেচ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ হইবে; ইহাকেই বশীকার বৈরাগ্য কহে। ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভোগের দোষ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিলে তবে বৈরাগ্য আসিবে। নচেৎ যে ভোগলালসা অভ্যাস হইয়াছে, ইহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। প্রতিক্ষণে দোষ অনুভব করিতে হইবে

অনাবশ্যক জোর পূর্ব্বক বন্ধ করিলে সেই কু অভ্যাস কোন সময় জোরে আক্রমণ করিবে।

জ্ঞানীব্যক্তির মুক্তি যেমন অনায়াসলভ্য, নিষ্কাম কর্ম্মরূপ মুক্তি তেমনি সহজসাধ্য; কিন্তু কর্ম্মফল মনে মনে রাখিয়া মুখে ত্যাগ করিলে হইবে না। অসাধুর কদাচারীর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, মন সংযত হইয়াছে, নিজের আনন্দে নিজে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কর্ম্মফলে বীতস্পৃহ হইয়াছেন, তিনিই সাধন-পথের পথিক, তিনিই উপযুক্ত শিষ্য, তিনিই সদ্গুরু দর্শনের উপযুক্ত পাত্র। ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—কর্ম্ম কর, কর্ম্মফলে যেন আশা না থাকে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭।২ ॥ গী

কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন আসক্তি না হয়। ইহাই সঙ্গ-বর্জ্জিত।

ভগবান ৪০।২ গীতায় বলিয়াছেন -

নেহাতিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মে বিফলতা নাই, বিঘ্নও নাই, অল্পমাত্র ধর্ম্মও মহাভয় হইতে রক্ষা করে। তবে ভয় কি? তবে আর কেন সকাম কর্ম্ম করিয়া, পাপ করিয়া, বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়া, যে আগাছার বন আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা আর

বৃদ্ধি করি? যাহা করিয়াছি, অম্লানবদনে, আনন্দিতমনে তাহাই পরিষ্কার করি।

অতএব কুকর্ম্ম ভুলিয়া সৎকর্ম্মে, ঈশ্বরের কর্ম্মে, যথাশক্তি যোগ দাও। যথাশক্তি পরোপকারে মন দাও। অর্থ দিয়াই যে উপকার করিতে হইবে এমন নহে; যাহার অর্থ নাই, সে কোথা পাইবে? শরীর, মন, বাক্যের দ্বারাও অনেক উপকার করা যায়। মনে মনে পরের মঙ্গল ইচ্ছা করিলেও সৎকার্য্য করা হয়। অন্যথায় কিসে পরের মন্দ হইবে, এই চিন্তা ত্যাগ করিয়া কিসে পরের মঙ্গল হইবে, এই চিন্তা করা সদা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানবের উপকার করিলে ভদ্রলোকে তাহা ভুলিয়া যায় না, ঈশ্বর কি ভুলিয়া যাইবেন? যদি ভুলিয়া জান, আরও ভাল হয়, কোল পাইবার সম্ভাবনা হয়। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখমোচন, ধর্ম্মপিপাসুকে ধর্ম্মজ্ঞান দান, নিজের দুঃখ ভুলিয়া পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, ইহাই তাঁহার সৃষ্টিপালনের সহায়তা করা; আর সর্ব্বজীবে অহিংসাই বৈরত্যাগ। তবে এই অহিংসা হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তরের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন;—

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

মনে মনে, অন্তরে অন্তরে, হাড়ে হাড়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তাহার নিকট বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ জগতে আর তাঁহার শত্রু থাকে না। হিংস্রজন্তুও তাঁহার নিকট আসিয়া হিংসা ভুলিয়া যায়।

এ সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা বলিতে হইল। কোন

সংবাদপত্রের ইংরাজ-প্রোপ্রাইটার সুলেখক একদিন বাঘ শীকার বাসনায়, বনে গমন করেন, কিছুদূর যাইতে না যাইতেই তিনি এক বাঘের সম্মুখে পড়িলেন, বাঘ তাহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তিনিও বাঘের অন্বেষণে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু শীকারের অন্বেষণে দৌড়ান ও প্রাণভয়ে দৌড়ান অনেক প্রভেদ, তদ্ভিন্ন বাঘ অতি বলবান বন্যজন্তু; আর তিনি মানুষ, সুতরাং অল্পক্ষণমধ্যেই বাঘ অদৃশ্য হইল; বহুক্ষণ ভ্রমণের পর কতকগুলি অসভ্য উলঙ্গ পুরুষের পশ্চাতে সেই বাঘ গৃহ পালিত কুকুরের ন্যায় বসিয়া আছে দেখিয়া, স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন, বাঘ কুকুরের মত মানুষের কাছে বসিয়া থাকে। একি। তবে কি পোষা? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে সেই অসভ্য, উলঙ্গ, মহাপুরুষদের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহারা ইঙ্গিতে বাঘকে আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন, যাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা বন্য হিংস্র ব্যাঘের অসাধ্য, মনুষ্য যত নিষ্ঠুরই হউন না কেন, কি সাধ্য যে, তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সাহেব তাঁহাদের কথা শুনিলেন, এবং ইহার রহস্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দর্শনে তাঁহার মনে ভক্তি ও দয়া যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছিল; তখন তাঁহারা দয়া করিয়া বলিলেন, হিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারিলেই হিংস্রজন্তুও হিংসা করে না, তুমি উহাকে মারিবার জন্য ইচ্ছুক, তাই সেও তোমাকে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে না; হিংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইলে, এ সকলের রহস্য জানিতে হইলে, এই

পথের পথিক হইতে হইলে, হিংসাত্মক ভোজন, (মৎস্য, মাংসাদি ভোজন) ত্যাগ করিতে হয়; তামসিক ভোজন ত্যাগ করিয়া ক্রমে সাত্ত্বিক ভোজী হইতে হয়, তবে এ সকলে অধিকারী হইতে পারা যায়, অন্যথায় বৃথা আশা। সা..বও উচ্চপ্রকৃতির ছিলেন, তিনি তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী চলিতে লাগিলেন, আজ তিনি একজন ঈশ্বর-অনুসন্ধানকারী মহাপুরু. আজ তিনি সংযমী, ভক্ত, কর্ম্মী ও জ্ঞানী। প্রকৃত সমাজভুক্ত হিন্দু না হইলেও, জনৈক হিন্দুশাস্ত্র-অনুসন্ধিৎসু, ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয়, ঈশ্বরপরায়ণ।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি ক .াণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০।১২। গী

অভ্যাসে অসমর্থ হইলে, আমার কর্ম্ম কর, কেবল আমার জন্য কর্ম্ম করিলে মোক্ষ হয়। ইহাই তাঁহার কর্ম্ম।

ভগবান ৪৯।২ গীতায় বলিয়াছেন;—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ .. ণাঃ ফলহেতবঃ ॥

হে ধনঞ্জয়! জ্ঞানযোগ অপেক্ষা, কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ফলাকাঙ্ক্ষী মানব কৃপণ অর্থাৎ হেয়। তুমি কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন কর, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন হয়

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ

৫।৩ গীতা।

কেহই কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ নিজ নিজ বশে আনিয়া সকলকে অবশ করিয়া কার্য্য করায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

৬।৩ গীতা।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলা যায়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

৭।৩ গীতা।

যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন, যিনি ফল কামনাহীন, তিনিই প্রশংসার যোগ্য। অতএব কর্ম্ম আমাদের অত্যাজ্য, সুতরাং কর্ম্মের ফলত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

এক্ষণে চিন্তার কথা কিছু বলিব। আমাদের প্রত্যেক চিন্তার একটি একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ ও বর্ণ আছে। যে চিন্তার যেমন ভাব ও যেমন প্রকৃতি—সেই চিন্তার তেমনি বর্ণ ও তেমনি আকৃতি। আধ্যাত্মিকতা—নবজলধর শ্যামবর্ণ; সহানুভূতি—সবুজবর্ণ; ভক্তি—নীলবর্ণ; জ্ঞান—পীত ও প্রীতি গোলাপী, এইরূপ এক এক ভাবের এক এক বর্ণ। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবের মূর্ত্তিও নানাপ্রকার, কোনটি গোলাকার, কোনটি

ফুলের আকার, কোনটি মুকুটের ন্যায়, কোনটি খড়্গাকৃতি, কোনটি শুণ্ডাকৃতি, এইরূপ অসংখ্য চিন্তার অসংখ্য আকার সে সকল অপার্থিব অদ্ভুত মূর্ত্তির বর্ণনা করা আমার ন্যায় মূর্খের সাধ্যাতীত। যদি মা সরস্বতী কণ্ঠে বসেন; যদি অনন্ত আকাশ কাগজ হয়, যদি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা লেখক হন, যদি অনন্ত লেখনি হন, আর যদি সমুদ্র মসি হয়, তবে যদি সেই সকল অনন্ত চিন্তার রূপ বর্ণনা কতকাংশে সম্ভব হয়।

ক্রোধে উন্মত্ত ব্যক্তির চিন্তাশক্তির মূর্ত্তির চিত্র বজ্রবর্ণ কৃপাণের ন্যায়। কোন পরমভক্ত ঈশ্বরে ভক্তিভাবে আত্মসমর্পণ করিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার চিত্র নীলপদ্ম সদৃশ। এই ছবিটির কথা মনে পড়িলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধ জন্য দুর্গা পূজার নীলপদ্মের কথা মনে পড়ে। এইরূপ আত্মসমর্পণ ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না।

এইরূপ ভক্তিই সিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। চিত্রগুপ্তের খাতায় অর্থাৎ ভুবর্লোকে আমাদের সকল চিন্তা প্রতিক্ষণেই প্রতিফলিত হইতেছে। চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ গুপ্তচিত্র।

পরহিত চিন্তা প্রভৃতি উচ্চ বা ভাল চিন্তাসকল মূর্ত্তি ধারণ করিবার সময় স্বর্লোক হইতে নিজের অনুরূপ সূক্ষ্ম উপাদান সংগ্রহ করে ও তাহারা স্বর্লোকে প্রকাশ পায়। কাম, ক্রোধ, লোভ আদি অতি নীচশ্রেণীর চিন্তার ভাব সকল স্বর্লোক অপেক্ষা নিম্ন জগৎ ভুবর্লোক হইতে উপাদান লইয়া অঙ্গ গঠন করে। চিন্তা যতই নিম্নশ্রেণীর হয়, যতই সকাম হয়, যতই স্বার্থ কলুষিত হয়, ততই তাহার অঙ্গ স্থূল হইতে স্থূলতর, স্থূলতম হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই দেহ সকলের বিষয় বলা হইয়াছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান), মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটি একত্রিত হইয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। ঐ লিঙ্গ-শরীরের মধ্যগত পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণময় কোষ; বোধরূপ পঞ্চ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয দ্বারাই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয় বলিয়া, ইহাকে আতিবাহিক দেহ কহিয়া থাকে।

প্রকৃতির কারণ যে অজ্ঞান, যাহাতে "আমি কে" এই জ্ঞানের বাধা হয়, ইহাকেই অবিদ্যা কহে। এই প্রকৃতি দুই প্রকার,—মায়া ও অবিদ্যা। প্রকৃতির সত্বঃ গুণের নির্ম্মল অবস্থা—মায়া, আর প্রকৃতির সত্বঃগুণের মলিন অবস্থা—অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে আমাদের কারণ-শরীর উৎপন্ন হয়। এই কারণ-শরীরকে আনন্দময় কোষ কহে। অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট যে দেহ, তাহাই অন্নময়কোষ, ইহাই দৃশ্য শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ। এই স্থূলদেহ পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাকে আধিভৌতিক দেহ কহে। পূর্ব্বোক্ত আতিবাহিক দেহ দীর্ঘকালের বিশ্বাস "আমি স্থূল, আমি স্থূল" এই কল্পনায় পুষ্ট হইয়া স্থূলদেহ বা আধিভৌতিক দেহ চক্ষু, কর্ণাদি প্রাপ্ত হয়, ইহাই পিতা মাতার সংযোগে উৎপন্ন হইয়া অন্নাদি দ্বারা বৃদ্ধি হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন লইয়া মনোময় কোষ হয়। এই মনোময় কোষের অন্য নাম কামময় দেহ; পূর্ব্বোক্ত নীচশ্রেণীর চিন্তার স্থান কামময় দেহ। আমাদের মনে যতই চিন্তার উদয় হইতেছে, ততই আমাদের কামময় দেহে, তাহা স্বমূর্ত্তিতে

প্রকাশ পাইতেছে। কামময় দেহকে ভাল করিতে হইলে, পবিত্র করিতে হইলে, সকল কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিন্তা করিতে হয়। কুচিন্তাই আমাদের পরম শত্রু। লোকে অনিষ্টকারীকে শত্রু মনে করিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু কুচিন্তার ন্যায় শত্রু আর নাই; এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন, নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের মিত্র; সুতরাং কুচিন্তাকে পরম শত্রুজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া একেবারে ত্যাগ করিবে। এইস্থলে একটি গল্প বলিতে হইল।

কোন দীনদরিদ্র তাহার দীক্ষাগুরুকে কহিল,—গুরুদেব! আপনার আদেশমত তপস্যাদি করা আমার অসাধ্য, কারণ আমার সদাই সকল বিষয়ের অভাব, সদাই নাই, আর নাই, কাজেই জপাদি করিবার সাবকাশ পাই না। গুরু কহিলেন, বাবা! একটি চাকর রাখিতে পার, তাহা হইলে আর কোন অভাব থাকে না। সে তোমার সকল অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতাযুক্ত; যখন যে অভাব হইবে, বিনা বিনিময়ে সে তাহা আনিয়া যোগাইবে; লোকটার দোষ এই যে, সে কখনই বসিয়া থাকিতে পারে না; যখনই কাজ দিতে না পারিবে, তখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবে। সে, কার্য্যের বিচার না করিয়া সকল কার্য্যই করে; কোন কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত বা অপারক নহে।

যখন কোন কার্য্য তাহার অকরণীয় নহে, এবং অসাধ্য কিছুই নাই, তখন সমস্ত দিনের উপযুক্ত কার্য্য দেওয়া অসম্ভব নহে, মনে করিয়া লোভের বশীভূত হইয়া শিষ্য গুরুর নিকট হইতে চাকর লইয়া গেল। বাটীতে লইয়া গিয়া সে বিপদ্‌গ্রস্ত

হইল, কারণ যে সকল কার্য্য শত শত লোকে বহু কষ্টে বহু দিনে সম্পন্ন করিতে পারে না, সে সেই সকল কার্য্য ক্ষণেকের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়া পুনরায় কার্য্য প্রার্থনা করিতে লাগিল; তখন শিষ্য আর কার্য্য সংকুলান করিতে না পারিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত ও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গুরুর নিকটে আসিয়া, চাকর ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন গুরু দয়া করিয়া কহিলেন— বাবা! চাকর আর ছাড়িবে না, তবে এক উপায় আছে শুন, এবার কার্য্য চাহিলেই তাহাকে একশত আটটি গাঁটওয়ালা একটি বাঁশ আনিয়া মাটিতে পুঁতিতে বলিবে এবং অন্য কার্য্য না পাওয়া অবধি ঐ বাঁশ দিয়া উঠিতে ও নামিতে কহিবে। ঐ চাকরই আমাদের মন, আর একশত আটটি গাঁটওয়ালা বাঁশ জপের মালা, মালা ছাড়িলেই কুচিন্তা আসিবে। যতই কুচিন্তা আসে, ততই কামময় দেহের স্থূল অংশের পুষ্টিসাধন হইতে থাকে, কামময় দেহ ততই মলিন হইতে থাকে, অতএব, দেহের স্থূল অংশ যত পুষ্ট হইতে থাকে, কামময় দেহ তত মলিন হইতে থাকে, পরজন্ম ততই নিকৃষ্টরূপে কুৎসিতরূপে নীচরূপে গঠিত হইবার কারণ হইতে থাকে, পরজন্ম ততই নীচবংশে হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিন্তা যত নীচ হয়, ক্রুর হয়, তাহার অণুও ততই স্থূল হয়। চিন্তার স্বভাব এই যে, নিজের প্রকৃতির মত আধার খুঁজিয়া লয়। কুচিন্তা মনোময় কোষের উচ্চস্তরে স্পন্দনোৎপন্ন করিতে পারে না। আর সচ্চিন্তা ভুবর্লোকের অপেক্ষাকৃত স্থূল উপাদান দ্বারা বাহিত হওয়া সম্ভব নহে, স্বর্লোকের সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। ক

তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ, বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রভৃতির কথা একটু মন দিয়া বুঝিলেই এ কথাটা একটু স্পষ্ট বুঝা যায়; বায়ু শব্দ বহন করে, কিন্তু বিদ্যুৎ ও আলো বহিয়া লইয়া যাওয়া স্থূল পদার্থ বায়ুর সাধ্য নহে; তজ্জন্য অন্যপ্রকার সূক্ষ্ম (ইথর) আধারের প্রয়োজন হয়; তদ্রূপ চিন্তা যত সৎ হয়, তাহা বহিয়া লইয়া যাইবার যানও ততই সূক্ষ্ম হওয়া দরকার হয়; সুতরাং যিনি যত উচ্চ চিন্তা করেন, তাহার কামময় দেহের নিম্নস্তর বা নিম্নাংশ তত অলসভাবে পড়িয়া থাকে; তাহাদের আলোচনার অভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্তরগুলি সর্ব্বদা স্পন্দিত হওয়ায় কামময় দেহ ক্রমে ক্রমে দিন দিন নির্ম্মল হইতে থাকে; সুতরাং সকল প্রকার কুচিন্তা, কুক্রিয়া ও কুপথ ত্যাগ করিতে হইবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তন্মাত্রও বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ।

স্ত্রীজাতিকে মাতৃরূপে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; যখনই কোন স্ত্রীলোক দেখিবে, তখনই মনে মনে বলিবে, "ইনি আমার মা।"

চক্ষুকে সর্ব্বদা সংযত করিবে, কারণ যাহা আমরা দেখি বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখি না—আমাদের মন যে দ্রব্যের মূর্ত্তি গ্রহণ করে, আমরা তাহাই দেখি। অতএব যখনই আমরা কোন কুদৃশ্য দেখি, আমাদের মন তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তি ধারণ করে। মনকে এইরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে দিবে না।

মনকে সর্ব্বদা সংযত রাখিবে। ঈশ্বরের নাম বা কোন ধর্ম্মসঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করাই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়।

নামের শক্তি, ভক্তি বা একাগ্রতার উপর নির্ভর করে না, নাম জপ করিতে করিতে ভক্তি, শক্তি, বিশ্বাস এবং একাগ্রতা আসিয়া থাকে। ইহারা আসিলে তবে নাম জপ করিব—এইরূপ মনে করিও না। তোমার কার্য্য তুমি করিয়া যাও, 'নাম' তাহার কাজ করিবে। জানিও, 'নাম' এবং নামীতে প্রভেদ নাই। বলপূর্ব্বক নাম করাই—নামে রুচি হইবার প্রধান উপায়। রসনা নাম করিতে চাহিবে না—মন বিরক্ত হইবে, সে সব গ্রাহ্য করিও না—দৃঢ়চিত্তে নাম করিয়া যাও। মনে মনে ধীরে ধীরে জপ করিবে। না পারিলে মনে মনে দ্রুত জপ করিবে; তদভাবে নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে। অভ্যাস হইলে অজ্ঞাতসারেও মনে মনে ফল্গু নদীর ন্যায় নাম জপ চলিবে—এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও মন জপ করিতে থাকিবে।

ঘরে মহৎ ব্যক্তিদের বা দেবতার ছবি রাখিলে, তাহা দর্শনে মন তাঁহাদের ভাব ধারণ করে। ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিবে এবং পাঠকালে ঈশ্বরকে নিজস্ব করিয়া লইবে, যোগ স্থাপন করিয়া লইবে। যাহাতে ভগবানের গুণ ও নাম-কীর্ত্তন থাকে, সেই পুস্তককে ভাগবত কহে, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন, তিনি ভক্ত। ভক্তিপূর্ব্বক যেখানে ভাগবত পাঠ হয়, তথায় ভগবান থাকেন। ভগবান কৃপাসিন্ধু, তাঁহার নিকট ছোট বড় নাই; স্থিরভাবে তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া আত্ম নিবেদন করিতে হয়। তিনি আমার ও আমি তাঁহার, মনে করার নাম আত্ম নিবেদন, এইরূপে নিজেকে মঙ্গলময়ে ও কল্যাণে পূর্ণ করিয়া লইতে হয়।

আবার ইহা জানিও- যখনই মন কোন চিন্তা করে, তখনই সেই রূপ প্রাপ্ত হইয়া তৎসদৃশ হইয়া যায়, অর্থাৎ সেইক্ষণের জন্য তাহাই হইয়া যায়, সুতরাং সর্ব্বদা সৎচিন্তা করিতে করিতে মন সৎভাবাপন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি যে চিন্তার দ্বারা মনকে যেরূপ গঠিত করে, তাহার পরজন্ম সেইরূপই পরিণত হয়, কারণ মনই জন্মগ্রহণ করে এবং মনেরই মুক্তি হয়।

এই কামময় দেহের উপর আমাদের নিজের চিন্তা ব্যতীত অপরের চিন্তার প্রভাবও বড় কম নয়। আমরা যাহাদের সঙ্গে বা নিকটে থাকি, তাহাদের চিন্তাসকল আকার ধারণ করিয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা ভুবর্ল্লোকে যে সকল তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে, সেগুলি আসিয়া আমাদেব কামময দেহকে নিরন্তর আঘাত করে, কিন্তু নিজের উপযুক্ত পাত্র পাইলেই তবে তাহাদের চেষ্টা বা কার্য্য সফল হয, নতুবা বৃথা হইয়া যায়; অর্থাৎ যাঁহাদের কামময় দেহ নির্ম্মল বা সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত, তাঁহাদের উপর নিম্নশ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কেবল উচ্চশ্রেণীর চিন্তাই মিত্রভাবে তাঁহাদের মনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সচ্চিন্তার বলবৃদ্ধি করে, কিন্তু যাহাদের কামময় দেহ এখনও স্থূল আছে, তাহাদের সঙ্গে অপরের নিম্নশ্রেণীর চিন্তাগুলি অতিশয় ও ভয়ানক ক্ষতিকারক।

যদি কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র মধ্যে ৩।৪টি কোন এক সুরে বাঁধা থাকে এবং অন্য ৩।৪টি অন্য সুরে বাঁধা থাকে এবং প্রথমগুলির মধ্যে একটিতে আঘাত করিয়াই তাহার ঝঙ্কার বন্ধ করা

যায়, তবে দেখা যায় যে, সেই সুরে বাঁধা অন্যগুলিও বাজিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতে ঝঙ্কার উঠিতেছে; কিন্তু দ্বিতীয়গুলি অর্থাৎ অন্য সুরে বাঁধাগুলি নীরব আছে; আবার যদি দ্বিতীয়গুলির মধ্য হইতে একটিকে লইয়া ঐরূপ আঘাত করা যায়, তবে দ্বিতীয়গুলি অর্থাৎ সেই সুরে বাঁধাগুলি বাজিয়া উঠে; প্রথমগুলি নীরব থাকে; তদ্রূপ যাহার মন যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাশক্তি তাহার মনে আঘাত করিয়া সেই চিন্তার বলবৃদ্ধি করে; অন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাকে আন্দোলিত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই বা পারে না; সুতরাং নীচ ব্যক্তির নীচচিন্তাশক্তি, নীচ ব্যক্তির মনকে আন্দোলিত করিয়া তাহার নীচ প্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করে; আর উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তিরা উন্নতমনার উচ্চপ্রবৃত্তির বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাদের উচ্চপ্রবৃত্তি দৃঢ় হয় নাই, নীচপ্রবৃত্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, নীচব্যক্তির কুচিন্তা দ্বারা আবার তাহাদের নীচপ্রবৃত্তিকে বলবান করিয়া দেয়, আর উচ্চমনা ব্যক্তির উচ্চচিন্তা ঐ ক্ষীণ উচ্চপ্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করিতে পারে। উচ্চ-প্রবৃত্তিগুলি যতই প্রবল হয়, কু-প্রবৃত্তিগুলি ততই দুর্ব্বল হইয়া ক্রমে লোপ হইতে থাকে, এইজন্যই নীচ লোকের সংস্পর্শে থাকা উচিত নহে; বোধ করি, ইহাই অবলম্বনে নীচজাতির অন্নাদি খাওয়া বা নীচ লোকের বিছানায় শয়ন উপবেশনাদির নিষেধ আছে। এই সকল নীচ প্রকৃতির লোক হইতে সদাই দূরে থাকা আমাদের উচিত। মন্দলোকেরা যে কেবলমাত্র কু-পরামর্শ দিয়া আমাদের মন্দ করে, তাহা নহে,

অজ্ঞাতসারে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদের কু-চিন্তা সকল অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কামময় দেহকে নিরয়গামী করে। তাই প্রবাদ আছে—"সংসঙ্গে কাশীবাস, অসংসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" সত্য সত্যই সঙ্গদোষে সর্ব্বনাশ হয়; আর সংসঙ্গে উন্নতি হইয়া থাকে।

যদি আমরা আমাদের সকল শরীর নিজের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারি, যদি ইচ্ছানুসারে আমাদের দেহের কার্য্য বন্ধ ও চালিত করিতে পারি, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমরা ভুবর্লোক স্বর্লোক আদির স্পন্দন অনুভব করিতে পারি; অর্থাৎ সেই সকল লোক দেখিতে বা তথায় ভ্রমণ আদি করিতে সক্ষম হই, তখন জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তিকেও দেখিতে পাই বা কথা কহিতে পারি। যদি আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য না লইয়া, পার্থিব কোন স্পন্দন গ্রহণ না করিয়া কেবল কামদেহের স্পন্দন গ্রহণ করিতে থাকি, তবেই পৃথিবীর জ্ঞান-রহিত হইয়া ভুবর্লোকের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সুতরাং ভুবর্লোকের অর্থাৎ মৃতব্যক্তিদের দেখিতে পাই ও মৃতব্যক্তিদের সহিত কথা কহিতে পারি। আবার যদি কামদেহের কার্য্য বন্ধ করিয়া মানসদেহের স্পন্দন গ্রহণ করিতে থাকি, তবে আর ভুবর্লোকের স্পন্দন অনুভব করিতে না পারিয়া স্বর্লোকের অর্থাৎ স্বর্গের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি। তখন স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াই ভুবর্লোক ও স্বর্লোক ভ্রমণ করিতে পারি; কারণ সমস্ত লোকই এই ভূর্লোকের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট, সর্ব্বদাই

সর্ব্বলোক সর্ব্বত্রই আছে, কাজেই আমাদের চৈতন্যশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চালিত করিতে পারিলেই তাহা অনুভব করিতে পারি। ইহা সাধনা দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়, আমরা সাধনবিহীন, সুতরাং স্থূলদেহের স্পন্দন ভিন্ন অন্য স্পন্দন অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু যখন মরিয়া যাই, তখন কামদেহ এবং মানসদেহের স্পন্দন-অনুভবশক্তি আসে; স্থূলদেহ না থাকায় ভূর্লোকের অনুভবশক্তি থাকে না। কাজেই কেবল ভুবর্লোক, স্বর্লোক আদি দেখিতে পাই কিন্তু মহাত্মাগণের সূক্ষ্মদেহ সুগঠিত ও কার্য্যদক্ষ হওয়ায় একই সময়ে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্লোক দর্শনের ক্ষমতা আছে; আবার যাঁহাদের কারণদেহ ও তৎযন্ত্র সকল হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সপ্তম লোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারেন; ইহারই নাম দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ষু। এই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া লইবার শক্তি আমাদেরও আছে, কিন্তু সাধনার প্রয়োজন; সাধনা অভ্যাস করিবার জন্য শিক্ষক বা গুরু দরকার। যখন আমরা সেই শক্তি পাইবার উপযুক্ত হইব, তখনই গুরু দয়া করিয়া দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবেন, অত্যদ্ভুত শক্তিসকল পাইবার উপায় সকলও বলিয়া দিবেন এবং সেই শক্তি দান করিবেন। আমরা যতই কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, পরনিন্দা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি, চিন্তা ও কামনার আন্দোলন করিব, ততই ঐ উচ্চশক্তি পাইবার অনুপযুক্ত পরমাণু দ্বারা কামদেহ স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আর যতই পরোপকারের ইচ্ছা, ক্ষমা, দয়া, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য, ইত্যাদি সচ্চিন্তা, সৎকামনা করিব,

ততই সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্মযন্ত্রগুলি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া সূক্ষ্মস্পন্দনগুলির অনুভূতি বৃদ্ধি হইবে; ভুবর্লোক ও স্বর্লোক আদির স্পন্দন গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্থূলদেহের স্থূল পরমাণুগুলি ততই নির্জীব ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইয়া যাইবে; সুতরাং কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রতিহিংসা আদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া যাইবে, এবং ঐ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তাস্রোতে মনকে সেই সকল চিন্তায় চিন্তিত করিতে পারিবে না, তখন মহাত্মাগণের উচ্চ ও সৎচিন্তা সকল মনকে আন্দোলিত করিয়া সৎপ্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করিতে থাকিবে।

যিনি কুচিন্তা দ্বারা স্থূল পরমাণুগুলির বৃদ্ধি করিয়াছেন, তিনি স্থূল বিষয়ই দেখিতে পাইবেন, আর যিনি যতই সৎচিন্তা করিয়াছেন, তিনি ততই উচ্চ স্পন্দনগুলি অনুভব করিতে পারিবেন। এইজন্য একই বস্তু বা বিষয় দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়; একই বস্তু বা কার্য্য দেখিয়া কেহ আনন্দিত হয়, সুখী হয়, আবার কেহ দুঃখিত হয়, অসুখী হয়, মর্ম্মাহত হয়। মনে কর, কোন স্থানে বহু ছাগ মহিষ আদি বলি হইতেছে দেখিয়া, কতকগুলি লোক আমোদে, উৎসাহে হাস্য করিতেছে, আনন্দে নৃত্য করিতেছে আর কেহ অসুখী হইতেছে, দুঃখিত হইতেছে, মর্ম্মাহত হইতেছে, প্রাণের জ্বালায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে বা রক্তস্রোত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে। কেহ নরহত্যা দেখিয়া বা করিয়া আনন্দিত, উৎসাহিত, প্রফুল্লিত হইতেছে, আবার কেহ পশু, পক্ষী, মৎস্য আদি হত্যা হইতে দেখিয়া দুঃখিত,

কাতর, মর্ম্মাহত হইয়া আকুলকণ্ঠে রোদন করিতেছেন! এই উভয়ে কত প্রভেদ; ইহারা প্রকৃতই এক জাতীয় মনুষ্য নহে, একজন পিশাচ, রাক্ষস; আর একজন পূজনীয় দেবতা। যিনি নিজের যেরূপ চিন্তা দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের, স্থূল ও সূক্ষ্ম পরমাণু সকলের যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়াছেন, যে স্পন্দন যেরূপভাবে গ্রহণের শক্তি শরীরে বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সেই স্পন্দনের ততই অনুভবশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থূল পরমাণুর বৃদ্ধিতে কুচিন্তা ও সূক্ষ্ম পরমাণুর বৃদ্ধিতে সচ্চিন্তার অনুভবশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমাদের চতুর্দ্দিকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, প্রভৃতি সকল লোকের সকল স্পন্দন সর্ব্বদা সমানভাবে রহিয়াছে, কিন্তু যাঁহার যে দেহের যে পরমাণু যেমনভাবে গঠিত হইয়াছে, তিনি সেইভাবে সেই সকল স্পন্দনের কোনটি অনুভব করিতেছেন, এবং কোনটি অনুভবের শক্তি না থাকায়, বুঝিতে পারিতেছেন না; অথচ সেই স্থানে থাকিয়াই অন্যে অন্যটি অনুভব করিতেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহার চৈতন্য যত বেশী, তাঁহার অনুভবশক্তিও ততই বেশী, সুতরাং তিনি ততই আনন্দময়, ততই সুখী, যাহার চৈতন্য যত কম, তাহার অনুভবশক্তি ততই কম, ততই মৃত বা নির্জ্জীব; সে ততই নিরানন্দ। মনে কর—একদিন প্রাতেঃ কোন কষাই অসংখ্য গো, ছাগ আদি হত্যা করিয়া গঙ্গায় গাত্র ধৌত করিতে গিয়াছে, আর জনৈক পবিত্রচিত্ত, শুদ্ধাচারী, ঈশ্বরপরায়ণ, দয়ালু ব্রাহ্মণও গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় একখানি নৌকা ডুবি হইয়া, কয়েকটি বালক, যুবা ও স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইল, ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে কোন

উপায়ে তাহাদের বাঁচাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস, আনন্দের স্রোত যে কি প্রকার, তাহা কবায়ের হওয়া দূরে থাকুক, তৎ অনুভবও হইবে না।

এইরূপ কেহ চৈতন্যের আধার, আর কাহারও চৈতন্যশক্তি একেবারেই ক্ষীণ, জড়বিশেষ, আবার মনুষ্যাপেক্ষা পশুপক্ষীদের চৈতন্যশক্তি কম; পশুপক্ষী অপেক্ষা বৃক্ষের আরও কম; বৃক্ষ অপেক্ষা প্রস্তর আদির আরও কম; পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির মধ্যেও আবার চৈতন্যের ইতর-বিশেষ দেখা যায়। লজ্জাবতী নামক লতার চৈতন্য অন্য লতা অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহাদের স্পর্শ করিলে তাহারা যে অনুভব করিতেছে, ইহা বেশ বুঝা যায়, স্পর্শ করিবামাত্র সে নিজের শরীর সঙ্কুচিত করে, আবার কিছুক্ষণ পরে পত্রগুলি প্রসারিত করিয়া থাকে। উচ্ছে ও লাউলতার স্পর্শবোধ আছে, ইহা আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও দেখিতে পাই যে, তাহাদের নিকটে কোন কঞ্চি আদি দিলে তাহা নিজের শুয়া দ্বারা ধরিবার জন্য চেষ্টা করে এবং অল্পক্ষণ চেষ্টার পরই তাহাকে জড়াইয়া ধরে। আমাদের চৈতন্যশক্তি যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা চৈতন্য স্বরূপের নিকটস্থ হইব এবং তাহাকে অবশেষে জড়াইয়া ধরিব; তখন আর আমার আমিত্ব থাকিবে না; আর আমার সুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে না; আর আমার জন্মমৃত্যুও থাকিবে না।

২। জ্ঞান যোগ।

এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে; এ জ্ঞান অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান নহে, অপরা জ্ঞান নহে, পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়। জ্ঞান দুই প্রকার। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান ও নিজে অনুভব করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান কহে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানী সমস্ত দৃশ্য, অদৃশ্য বস্তু মাত্রকে ঈশ্বর দেখেন, সুখের ইচ্ছা রহিত হন; শত্রু, মিত্র সমান হইয়া যায়, ভয়, কাম, ক্রোধ নির্ম্মূল হয়; এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি শান্তিলাভ করিয়া নিজেকেও ঈশ্বর দেখেন।

আবার জ্ঞান হইলে কর্ম্মফলের কার্য্য হইয়াও জ্ঞানীর তাহা ভোগ হয় না, অর্থাৎ হয় ত পূর্ব্বজন্মজ কু-কর্ম্মের ফলস্বরূপ কার্য্যটী হইল, অথচ তিনি তাহা গ্রাহ্য না করায় বা আহ্লাদিত হওয়ায় দুঃখভোগ হইল না, অতএব পূর্ব্বজন্মজ কুকর্ম্মের ফলস্বরূপ ফলভোগ ভাবিয়া অর্থাৎ যে কুকর্ম্মের ফল স্কন্দে ছিল, তাহা অদ্য শেষ হইল ভাবিয়া, আমরাও দুঃখকে সুখ করিয়া লইতে পারি। সৎকর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখভোগও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

জ্ঞান হইলেই কর্ম্মফল সকল ধ্বংস হইয়া যায়। ভগবান বলিয়াছেন—

জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মানং। ১৯।৪ গীতা।

তুলসিদাস বলিয়াছেন,—

কয়লা কি ময়লা ছুটে

যব্ আগ্ করে পর্‌বেশ॥

জগতে এমন লোক আছেন, যাঁহারা ভক্তির সাহায্য না লইয়া একেবারে জ্ঞানমার্গে থাকিয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, পরিণাম নাই, সেই অবিনাশী, নিত্য সৎস্বরূপ; তাঁহার নির্ণয় করা জ্ঞানের কার্য্য অর্থাৎ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্থির করাই জ্ঞানের কার্য্য ও প্রথম সোপান। সেই এক সৎস্বরূপ পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সকলই অনিত্য, বহুত্ব কিছুই নাই; আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বহু দেখি, প্রকৃত সবই এক, একই সব। তাই তুলসিদাস বলিয়াছেন,—

সব ভুল।

মালিক্ না ভুল।

সমস্তই মায়া-প্রসূত, ক্ষণিক অভিব্যক্তি মাত্র। এই একত্বের ভাব হইয়া যতক্ষণ বহুত্বের অভাব না হইবে, সে পর্য্যন্ত মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাতে পড়িতেই হইবে। কঠ উপনিষদে আছে।—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ৪।১০

যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যে ব্যক্তি ইহাঁকে নানা দেখে, সে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

মানবের আত্মা যে সবই এক, ইহা ঐকান্তিক চিন্তা দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। জীবাত্মা জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্যই দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া বহুকোষে আবদ্ধ হইয়াছেন, যথা,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। জ্ঞানীব্যক্তি এই কোষগুলিকে একে একে মোচন করিয়া আত্মার সন্ধান করিবেন; জ্ঞানের ইহাই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সকলকে প্রশমিত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহা হইতে আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করা, ইন্দ্রিয়গণকে নিজের ইচ্ছাধীন করা, বহির্জগতের বাধা হইতে দূরে থাকিয়া আত্ম-শক্তির কার্য্য অনুভব করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন।

এই জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য জ্ঞানময় মহাদেবের উপাসনা করিতে হয়; ঈশ্বরে জ্ঞানের, ব্রহ্মজ্ঞানের, পরমপুরুষের জ্ঞানের সমষ্টি মহাদেব। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা গঠিত, পরমপুরুষের জ্ঞান দ্বারা গঠিত মহাদেব অর্থাৎ পরমপুরুষের পূর্ণ জ্ঞানের নাম মহাদেব; তাই মহাদেব জ্ঞানদাতা। যেমন শীতার্ত্ত ব্যক্তির উত্তাপদাতা অগ্নি, যেমন পৃথিবীতে উত্তাপদাতা সূর্য্য; যেমন মেঘের সৃষ্টিকর্ত্তা সমুদ্র; যেমন ঈশ্বরে প্রেমদাতা রাধা, তেমনি জ্ঞানদাতা মহাদেব; মহাদেব যেন পরম জ্ঞানের সমষ্টি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধনা করিতে হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কার্য্য বিশেষরূপে জানিয়া, সাধনা করিতে হয়, আত্মশ্লাঘা রাহিত্য, অদাম্ভিকত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, মনঃসংযম, বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, অনাসক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টে সমজ্ঞান,

সর্ব্বদা আত্ম-দৃষ্টি, একান্তভক্তিমান, নির্জ্জনে বাস ও মনুষ্য-সমাজে বিরাগ, তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের শেষ ফল সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ এবং মোক্ষ এই বিংশতি প্রকার জ্ঞানে সাধন সমাহিত হয়, এবং ইহা ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান-মূলক জানিতে হইবে এবং উক্তগুলি একে একে সাধনা করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব যথা—পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), পঞ্চমহাভূতের তন্মাত্র পঞ্চ (যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) দশ ইন্দ্রিয়; কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণী, পাদ, পায়ু, উপস্থ)। জ্ঞানেন্দ্রিয (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মূল-প্রকৃতি।

এই সন্ন্যাসে যোগী ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় হইতে নিজেকে আত্মার অভিমুখী করেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়—স্থূল জগৎ, আর মনের বিষয়—সূক্ষ্ম জগৎ হইতে আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগী জন-সমাজ ত্যাগ করেন, এবং আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা ও ধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

আবার সংসার ত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাস সাধিত হইতে পারে। কামনা ও আসক্তিবিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ করায় ভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, কিন্তু কামনা ও আসক্তি থাকিলেই জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য। অবিদ্যা বা অজ্ঞানজনিত বিষয়-বাসনাই কামনা ও আসক্তি।

যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, মনের প্রত্যেক গতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এমন নিঃসঙ্গবান পুরুষই ব্রহ্মে প্রবেশের অধিকারী। কঠোপনিষদে আছে,—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসাসহ।
বুদ্ধিশ্চ বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥ ৬।১০॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি কোন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত না হইয়া কেবল সেই পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর থাকে, তখন বুদ্ধির সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এই পরমাগতিই মনুষ্যকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী করে। ঈশোপনিষদে আছে,—

যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতন্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥

যখন যাঁহার, আত্মাতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, এই জ্ঞান হয়, তখন তাঁহার আর শোক ও মোহ থাকে না, তখন তিনি সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯।৬ গী।

সমাহিতচিত্ত ও সর্ব্বত্র-সমদর্শী, আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে অভেদে দর্শন করেন

জ্ঞান দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কর্ম বন্ধ হয়। মহাদেব জ্ঞানময় জ্ঞানের সমষ্টি; তাই মহাদেব মদননাশক

মোটের উপর, জ্ঞানমার্গের চরম সীমা মুক্তি অর্থাৎ আত্মার চরম মহৎ অবস্থা; কিন্তু যতই জ্ঞানী হউন না কেন,

কর্ম্ম করিতেই হইবে। আর ভক্ত ত কর্ম্মের জন্য মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিবেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্॥

২৫।৩। গীতা

হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিবেন, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য তেমনি কর্ম্ম করিবেন; অন্যথায় কেহই কর্ম্ম করিবে না, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, সকলেই সেই অনুকরণ করিয়া থাকে। আবার ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন; —

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩।৩

যদি আমি অলস হইয়া কর্ম্ম না করি, তবে সকল মানুষ আমার অনুকরণ করিবে। তাহা হইলে কর্ম্মলোপ হেতু অধর্ম্ম প্রচার হইবে। অতএব জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে।

আর জ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ তাহাও ভগবান বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

৩৯।৪ গীতা।

একনিষ্ঠা হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, এবং জ্ঞান লাভ হইলেই শীঘ্র শান্তি প্রাপ্ত হন।

কিন্তু জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ ভগবান গীতায় ইহাও বলিয়াছেন;—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪।৩

আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে লোক সকল ধর্ম্মলোপ জন্য বিনষ্ট হইবে, এবং আমাকে বর্ণশঙ্করের কর্ত্তা হইতে হইবে। অতএব তাঁহাকেও লোক সংগ্রহ অর্থাৎ লোকসকলকে কর্ম্ম করাইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইয়াছে; সুতরাং লোক-শিক্ষার জন্য জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। এই সঙ্গে ধ্যানযোগও অবলম্বনীয়। কারণ গীতায় আছে;—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥

২৪।১৩ গীতা।

কেহ কেহ ধ্যান যোগের দ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্য কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞান লাভ হয়, তাই ভগবান নিষ্কাম কর্ম্মেরই পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন;—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

৩৭।৫ গীতা।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥

৩৮।৪ গীতা।

জ্বলন্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিও সকল কর্ম্মকে নষ্ট করে। জ্ঞান অপেক্ষা কিছুই নাই, সেই জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায়।

জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তি লাভ হয়, কিন্তু সেই জ্ঞান আত্ম শুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় এবং কর্ম্মদ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

১১।৫ গীতা।

যোগীগণ কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া, শরীর, মন, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়, আত্মশুদ্ধি হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, বা জ্ঞানই মুক্তি।

এক্ষণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হইবার উপায় নাই, এবং জ্ঞান হইলেও কর্ম্ম করিতে হইবে সুতরাং কর্ম্ম অত্যাজ্য।

সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে, নিষ্কর্ম্মা থাকিবার উপায় নাই। জ্ঞানী আত্মশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম, আর অজ্ঞানী বন্ধনের হেতুভূত সকাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

৩। ভক্তি যোগ।

ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং তাহাতে দারুণ আসক্তির নাম ভক্তি। এই ভক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে। জ্ঞানহীন

ভক্তি ক্ষীণবলসম্পন্ন। বিশ্বাসই ভক্তির মূল। জ্ঞান হইলেই বিশ্বাস আসে, তখন ভক্তি দৃঢ় হয়। যতই ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, ততই তাঁহার পরীক্ষায় নির্ভর করিতে সাহস হয়। সেই দুঃখ, সেই কষ্ট সহ্য করিতে ক্ষমতা জন্মে। সেই দুঃখ, সেই কষ্টে অনুতাপ না হইয়া কর্ম্মভোগ হইয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিয়া আনন্দানুভব হইতে থাকে; সুতরাং কুকর্ম্মের ফল সকল আর তত দুঃখ দিতে পারে না। যতই ঈশ্বরে নির্ভর বৃদ্ধি হয়, ততই আত্মনিভরতা কমিয়া যায়. যত আত্মনিভরতা কমিতে থাকে, ততই তাঁহার শরণাগত, ততই তাঁহার নিকটস্থ হওয়া যায়, যতই তাঁহার নিকটস্থ হওয়া যায়, দুঃখ ততই সরিয়া যায়।

জ্ঞানে বিশ্বাস, বিশ্বাসে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধায় নিষ্ঠা, নিষ্ঠায় রুচি, রুচিতে আসক্তি, আসক্তিতে সুখ, সুখে অনুরাগ, (সুখানুশয়ী রাগঃ। পাতঞ্জল), অনুরাগে ভক্তি আসিয়া মানসিক উন্নতি হইতে থাকে। তখন কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণের ক্ষমতা জন্মে। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিলেই কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ আসিয়া ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান; তখন আর ভক্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক থাকেন না; এক হইয়া যান অর্থাৎ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যান।

এই ভক্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; কারণ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জগতের হিতসাধন করিতে পারা যায় না। ভক্তিমার্গেরও উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া, কিন্তু জ্ঞানলব্ধ একত্ব হইতে ভক্তিলব্ধ একত্বের কিছু পার্থক্য আছে। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, প্রেমদ্বারা যে লোক-

হিত-ব্রত সাধিত হইবে, তাহা বিপথে পতিত হইতে পারে; হিত করিতে ভ্রমক্রমে অহিত সাধন হইয়া পড়িতে পারে।

অতএব জ্ঞানহীন ভক্তি উৎকৃষ্ট নহে; কারণ, লোক-হিত-সাধন জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। আর ভক্ত-জীবনের সার পদার্থ—লোকের অতীব ও উৎকৃষ্ট মঙ্গল-সাধন। ভক্তের চরম উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত ভক্তের সম্মিলন, কিন্তু তাহা বলিয়া ভক্তের আত্মবিস্মৃতি প্রার্থনীয় নহে। পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মারূপে প্রকাশিত।

যে পর্য্যন্ত সমস্ত জীবাত্মা এক পরমাত্মায় আসিয়া মিলিত না হয়েন, সে পর্য্যন্ত ভক্ত কাহাকেও বিস্মৃত হইবেন না। ভক্তি-মার্গে প্রেমই ভক্তের পরিচায়ক। সেই প্রেমব্রত সাধনের জন্য শক্তির আবশ্যক; ভক্ত সেই শক্তি লাভের জন্য ঊর্দ্ধতন মহাত্মাগণে ও প্রেমব্রত কার্য্যের জন্য নিম্নতন ব্যক্তিতে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঊর্দ্ধতন মহাত্মাগণের নিকট তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি, বল ও তেজ লাভ করিবেন এবং তন্নিম্নে দান করিবেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১ ৩।

যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাদের সংবর্দ্ধন কর, তাঁহারাও তোমাদের সংবর্দ্ধন করিবেন; এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া মঙ্গল লাভ করিবে। এই শক্তিকামনা, তাঁহার নিজের মুক্তির জন্য নহে, নিম্নতন ব্যক্তিদের জন্য; কারণ যে পর্য্যন্ত একটি জীবাত্মাও পড়িয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভক্ত নিজের মুক্তি চাহেন

না; ইহাই তাঁহার প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ও সেবা। এই সেবা ঈশ্বরের সেবা। নিজেকে, ঐশীশক্তি চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ করাই, তাঁহার কামনা; ঊর্দ্ধতন আলোককে, নিম্নস্তরে চালাইবার জন্য নিজেকে যন্ত্রস্বরূপ করাই তাঁহার বাসনা; নতুবা নিজে জ্যোতির্বিশিষ্ট বা দীপ্তিমান হইবার জন্য নহে। পরের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে প্রেমেই আরম্ভ করিয়া প্রেমেই শেষ করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহাকে জগতের আধ্যাত্মিক অংশের জ্ঞানার্জন করিতেই হইবে; কারণ, তাহা না হইলে জগতের হিতসাধনের উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। নিঃসঙ্গ হইলে চলিবে না; কারণ, তিনি নিজের মোক্ষ চাহেন না। যাহারা তাঁহার নিজের সোপানে উঠিতে পারে নাই, তাহাদের উঠাইবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। পার্শ্ববর্ত্তী জীবে ভালবাসা ও তাহাদের মঙ্গল সাধনে হইতে প্রেম আরম্ভ, আর পরম পুরুষে আত্মসমর্পণ ইহাই শেষ। তাই বলিয়াছি;—প্রেমেই আরম্ভ, প্রেমেই শেষ।

ভক্ত সমাজচ্যুত হইয়া নির্জ্জনে গিয়া একাকী থাকিলে চলিবে না; কারণ তাঁহাকে পরের সেবার জন্য ও পরের উন্নতির জন্য সুযোগ খুঁজিতে হইবে; যেমন নিজের আত্মার উন্নতি করিতে হইবে, তেমনি পরেরও উন্নতি করাইতে হইবে। জ্ঞানাবলম্বীর ন্যায় তাঁহাকে নির্জ্জনে অবলম্বন-শূন্য হইয়া থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ন্যাস অনন্ত বিষয়ের ত্যাগ, কারণ, তাহা না হইলে তাঁহাকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই জ্ঞানীর সন্ন্যাস কঠোর ও শুষ্ক।

আর ভক্তের সাধনা মনুষ্যজাতির মঙ্গল কামনা, সুতরাং এই

সন্ন্যাস সরস, প্রেমময় ও প্রেমের আধার স্বরূপ। জগতের কর্ম্ম করাই তাঁহার জীবনের সারব্রত; জগতের জন্যই তাঁহার জন্ম; তাঁহার নিজের জন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না। তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়সকল মন ও ইন্দ্রিয়ের কাজ করিবে মাত্র, তাঁহাকে আবদ্ধ করিবে না। কর্ম্ম করা পর্য্যন্ত তাঁহার কাজ, ফলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত আছে।

যে সকল মহাত্মা জগৎ পরিচালন করিতেছেন, তাঁহাদের উপর কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মে আসক্ত হন না। ইহাতে যদি কোন দোষ ঘটে, কোন ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহার অনিষ্ট-কারিতা অনেক পরিমাণে কম হয়। যদিও সেই দোষ জন্য তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয়, তথাচ তাহার পরিণাম মঙ্গলজনক কারণ অমঙ্গল সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না এবং ঐ দুঃখ তাঁহার শিক্ষক হইবে ভাবিয়া, ঐ দুঃখে বড়ই আনন্দানুভব করেন; কেন না, এই দুঃখই তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে।

এইরূপে তিনি দিন দিন নিজ কার্য্য সাধনের নূতন নূতন উপায় দেখিতে ও শিখিতে থাকেন।

প্রথমতঃ, আমাদের প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য এই মঙ্গল কামনা আরম্ভ হইবে; এমন কি, নিজগৃহ হইতে আরম্ভ হইবে, অপরের ভার লঘু করিয়া নিজে তাহা বহন করিবেন।' ক্রমে সেই প্রেম সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইবে। মহাপুরুষেরা ভক্তের জন্য যে বিধান করিবেন, তিনি নিজে ভোগ না করিয়া অপরের মঙ্গলের জন্য তাহা ব্যয় করিবেন। মহাত্মাগণ যাহা দান করেন তাহা এক ব্যক্তির জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য করিয়া থাকেন। ভক্তজীবন

কেবল অন্যের গুণ দেখিবেন; দোষ দেখিতে পাইবেন না, কিম্বা মহত্ত্বের দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিবেন। নিজের ও পরের উন্নতি করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যে সুর গাহিতে হইবে, তাহা ভক্তি বাঁধিয়া দিবে। বাদ্যযন্ত্র মধ্যে সুর বাঁধা যেরূপ, জীবাত্মার পক্ষে ভক্তিও সেইরূপ; হৃদয়ের সুর বাঁধাই ভক্তি। হৃদয়ের সুর বাঁধা হইলেই তাহা হইতে জ্ঞানের, প্রেমের ও পবিত্রতার বিকাশ হয়, আর তাহাতেই জাগতিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা যায়।

ভক্তির অর্থ—জ্ঞানচক্ষু, প্রসন্নতা এবং কীটানুকীট হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে গভীর প্রেম বুঝায়। ইহাই ভক্তের শান্তি ও মুক্তি। যখন সমস্ত জীবের মুক্তি হইবে, তখন ভক্তের মুক্তি হইবে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

১২।৬ গীতা।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

১২।৭ গীতা।

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তি দ্বারা কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার উপাসনা করেন, হে পার্থ, সেই আমাতে নিবিষ্টচিত্ত-ব্যক্তিদের মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি।

এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত যে, কোন্ পথটি সহজ এবং সাধ্যায়ত্ব; ভগবান বলিয়াছেন,—আমাতে মন সংযোগ দ্বারা জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে আমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করিবে। যেহেতু—

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাস্যাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২।১২গী

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা ফলত্যাগ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ফলত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিলে জ্ঞান হয়, এবং সেই কর্ম্মে বন্ধন হয় না, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর একটিমাত্র জীব থাকিতে ভক্ত মুক্তি চাহেন না, সুতরাং ভক্ত ঘোর কর্ম্মী; অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের প্রধান অবলম্বন। আবার ইহাও বুঝা গেল যে, এই তিনটি পথই এক অর্থাৎ কোন পথকেই একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; কোনটিই একেবারে ত্যাগ করিলে চলিবে না। ভক্তিমান্ হইয়া নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবস্থা আসে। ভক্তি না হইলে কর্ম্ম করিবার শক্তি জন্মায় না এবং ভক্ত সর্ব্বজীবের মুক্তি না হইলে মুক্তি চাহেন না। তাই, ভক্ত এত গুরু ও গরীয়ান; অতএব ভক্তের চরণে কোটী কোটী প্রণাম। নিষ্কাম কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

পরিশিষ্ট।

উক্ত তিন পথাবলম্বীরই ঈশ্বরোপাসনা কর্ত্তব্য। সকলেই ঈশ্বরোপাসক, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, হিন্দুর মধ্যে আবার কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি গাণপত্য—সকলেই সেই একমাত্র অব্যয়, নিত্য সৎস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে দ্বেষভাব দেখা যায়, ইহা কেবল ভ্রমবুদ্ধি মাত্র। যখন দৃশ্যবস্তু মাত্রেই সেই ব্রহ্ম, তখন যিনি যাহাই বলিয়া ডাকুন, তাঁহাতেই পৌঁছিবে-তাঁহাকেই ডাকা হইবে; তবে উপাসকের বাসনানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির সাধনা করিতে হয়, এবং প্রত্যেক কার্য্যেও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করিতে হয় যথা—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, বিবাহে চ প্রজাপতিম্।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রম।
নারায়ণং তনুত্যাগে, শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং, সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ, পাবকে জলশায়িনম্॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ, পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

শব্দ।—শব্দের দ্বারা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ উচ্চারণ ক্রিয়াশীল। বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সংযুক্ত হইয়া ক্রিয়াশীল করার নাম মন্ত্র। প্রত্যেক শব্দ বা ঈশ্বরের

প্রত্যেক নামের ক্রিয়া পৃথক পৃথক, তাই লোকে বলিয়া থাকে, হরি এই নামের গুণে মুক্তি হয়, অর্থাৎ হরি এই নাম উচ্চারণের (শব্দের) গুণে মুক্তি হয়। তাই প্রবাদ আছে—হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ। ক্রিয়া হইতে পারে, এরূপ ভাবে শব্দ বা বর্ণ বিন্যাসের নাম মন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধিত হয়। কোন মন্ত্র উচ্চারণে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, কোন মন্ত্র উচ্চারণে পুত্রোৎপাদন-শক্তি শরীরস্থ হয; কোন মন্ত্র উচ্চারণে অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়; কোন মন্ত্রোচ্চারণে বৃষ্টি হয়, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার মন্ত্র দ্বারা অসংখ্য কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্র আবার বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সহিত সাধনা করিতে হয়, তবে সুশৃঙ্খলে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয, অন্যথায় বৃথা হয, বা অল্প ক্রিয়াশীল হয়। ইহা আবার শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ দ্বারা হইলেই সুসম্পন্ন হইযা থাকে। অন্যথায অজ্ঞানী অধার্ম্মিক, অবিশ্বাসী, নাস্তিক দ্বারা হইলে বিফল হয। কয়েক বৎসর গত হইল, কাশীস্থ জঙ্গমবাবা সকল সমক্ষে অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলেন; তখন সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া সাধারণে পদব্রজে চলিযা গিযাছিলেন, তাঁহাদের একটুমাত্র উত্তাপ লাগে নাই।

যাঁহারা গায়ক, তাঁহারা জানেন যে, রাগ রাগিণীদের সুরে মানসিক ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে। যেমন কালাংড়া আনন্দোৎপাদক, তজ্জন্য কালাংড়া বিবাহ আদি উৎসবে বাদিত হইয়া থাকে। মালকোষ, ভৈঁরো আদি ভক্তি-রসোৎপাদক, সুতরাং দোল, রাস আদি উৎসবে গাহিত হইয়া

থাকে দীপক আদি বীর-রসোৎপাদক; সুতরাং যুদ্ধাদি কার্য্যে বাদিত হয়। এইরূপ অসংখ্য রাগ রাগিণী অসংখ্য মানসিক ভাব উদ্দীপনে উপযুক্ত; রাগরাগিণী শব্দ ও সুর ভিন্ন আর কিছুই নহে; মন্ত্রও সুরে উচ্চারণের বিধি আছে; অতএব এক্ষণে বেশ অনুভব করা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম উচ্চারণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভিন্ন বাসনা বা কামনা বিশিষ্ট হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই একমাত্র সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে ডাকিয়া থাকেন। মুক্তিপ্রার্থী হরি বা প্রণব দ্বারা যাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন, পুত্রার্থী প্রজাপতি নামে তাঁহাকেই ডাকিয়া থাকেন; ইত্যাদি। পুত্রার্থী হরি বলিয়া ডাকিলে হইবে না। মুক্তিপ্রার্থী নির্গুণ উপাসক; আর পুত্রার্থী সগুণ উপাসক, আবার ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের নিকট তাঁহার রূপও ভিন্ন ভিন্ন। মুক্তিপ্রার্থীর পক্ষে তিনি ক্রিয়াহীন নবীনমেঘবর্ণ কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া দ্বিভুজে প্রণব উচ্চারণে বাঁশী বাজাইবেন: কিছুই করিবেন না; নির্গুণ নির্ব্বিকার; আর পুত্রার্থীর নিকট সগুণ ক্রিয়াশীল চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ। বর্ণের (রঙের) ক্রিয়া আছে, তাহা অনেকে জানেন। বর্ণের ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেক রোগের চিকিৎসা হইতেছে। সূর্য্যরশ্মিতে সাত প্রকার বর্ণ থাকায় সূর্য্যরশ্মি রোগনাশক। উপাসনার রীতিপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন। নানাপ্রকার দেবতার উপাসনাও তাঁহারই উপাসনা; তিনিই তৎসমুদয়ের ফলদাতা। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

২১।৭। গীতা।

যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনা করেন, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তিতে তাদৃশী দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি, অর্থাৎ সে সমস্তই আমাতে পৌছায়, কারণ আমিই সব।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

২৩।৯। গীতা।

তবে যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার সাধনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকেন।

স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্ত স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

২২।৭। গীতা।

সেই ভক্ত সেই প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করেন, পরে আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা লাভ করেন; আবার যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি সেই প্রকার গতি পাইয়া থাকেন। যথা—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

২৩।৭। গীতা।

অল্পবুদ্ধি, তাঁহাদের সেই ফল বিনাশশীল, দেবযাজীরা অন্তবিশিষ্ট দেবগণকে পান, আমার ভক্তগণ আমাকে পান অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যান।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্॥
২৫।৯। গীতা।

দেবার্চ্চনাকারীগণ দেবলোক, পিতৃগণের অর্চ্চনাকারীগণ পিতৃলোক, ভূত-পূজাকারীগণ ভূতলোক এবং আমার অর্চ্চনা-কারীগণ আমাকে প্রাপ্ত হন।

আবার মনুষ্যমাত্রেই সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণবিশিষ্ট, যিনি যে গুণপ্রধান, তিনি তদনুরূপ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥
৪।১৭। গীতা।

সাত্বিক ব্যক্তি দেবগণের, রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ রাক্ষসের, আর তামস ব্যক্তিগণ ভূত ও প্রেতগণের উপাসনা করিয থাকেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬।৯। গী

যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া থাকি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্বমদর্পণম্ ॥২৭।৯ গী

হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি অন্য উপাসক, সকলেরই এই পরমাত্মার উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য; আবার বৈষ্ণবকেও প্রকৃতির উপাসনা করিতেই হইবে; কারণ শারীরিক শক্তি, জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধিশক্তি এ সমস্ত শক্তিদাতা প্রকৃতি; শক্তি ভিন্ন শক্তিদাতা অন্য কেহ নাই; সুতরাং সকলেই শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন; শক্তি চাহি না, কেহই বলেন না। ভক্ত যে এমন নিঃস্বার্থ; তিনিও পরের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রার্থী: এই প্রকৃতিও অনাদি; অতএব এই প্রকৃতির উপাসনাও সকলকেই করিতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥
১৯।১৩। গীতা।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; বিকার ও সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, গুণত্রয়ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে; অতএব পরমাত্মার ও মূল প্রকৃতির উপাসনা উভয়ই কর্ত্তব্য। ঈশোপনিষদে আছে—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো-য-উ সম্ভুত্যাং রতা ॥
১২।

যাঁহারা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন কেবল তাঁহার শক্তি স্বরূপা প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারা তমোময় লোকে গমন করেন ; আর যাঁহারা প্রকৃতি ভিন্ন কেবলমাত্র পরমপুরুষ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিকতর গাঢ় অন্ধকারাবৃত নরকরূপ স্থানে প্রবেশ করেন। ঈশোপনিষদে আরও আছে ;—

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা ও পরমপুরুষ পরমাত্মার উপাসনা, এই উভয় উপাসনই এক ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিয়া, যাঁহারা উভয় উপাসনা করেন, তাঁহারা পরমপুরুষের উপাসনা দ্বারা অধর্ম্ম ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পান ; আর প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত পান করিতে থাকেন।

এই প্রকৃতি ও পুরুষের উপাসনা করিবার জন্য গুরুসেবা ও গুরুর উপাসনা করিতে হয়। গীতায় আছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন ॥ ৩৪।৪ ॥

গুরুসেবা প্রণিপাত ও জিজ্ঞাসা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের উদয় হইয়া যোগ দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত—সম+প্র+জ্ঞা ধাতু অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞান থাকা ; আমি ও আমার জ্ঞান থাকা। পরে যখন আর কোন জ্ঞান থাকে না, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। এই অবস্থায় যোগীর কোন জ্ঞান, কোন চিন্তা থাকে

না। যোগী জড়বৎ অবস্থায়, নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকেন মাত্র; মনের কোন বৃত্তিই থাকে না।

যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ। ২। পাতঞ্জল।

চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।

মনের বৃত্তি পাঁচটী, তাহা মোটামুটি দুইভাবে বিভক্ত।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঃ অক্লিষ্টাঃ। ৫ পাতঞ্জল।

ক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশদায়ক; আর অক্লিষ্টা অর্থাৎ সুখদায়ক। কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, অনুরাগ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি ক্লেশদায়ক আর ভক্তি, শ্রদ্ধা, রুচি, বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মোক্ষের হেতু বলিয়া অক্লিষ্ট অর্থাৎ সুখদায়ক।

এই সমস্ত মনবৃত্তি সংস্কার সমেত এককালীন লোপ হওয়ার নামই যোগ। প্রথমে নিরবলম্ব ধ্যান মনুষ্যের অসাধ্য বিধায় যোগীবর পতঞ্জলি বাহ্য স্থূল, বাহ্য সূক্ষ্ম, আভ্যন্তরিক স্থূল ও আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মে অভ্যেগ হইলেই যোগসিদ্ধ হয়। যোগ সিদ্ধের অন্য নামই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। বাহ্য স্থূলে চিন্তা আরম্ভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত যে সকল অবস্থা ঘটে; তাহা এস্থলে বলা অসাধ্য। (পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য)

কোন কোন সম্প্রদায় এই বাহ্য স্থূল (মূর্ত্তি) উপাসনার বিরোধী। তাহা ভ্রম; কারণ একেবারে আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মে, (পরমাত্ম) ধ্যান হয় না। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষে মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা আছে; খৃষ্টানদের পবিত্র ক্রুশ (†) চিহ্ন লিঙ্গপূজার নিদর্শন বলিয়া আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত-

গণের মত। কোন প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া কোন মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা বা ধ্যান করিলেও মূর্ত্তিপূজা করা হয়।

ধ্যান করিতে হইলে নিরবলম্বন ধ্যান হয় না; সুতরাং যাঁহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করিয়া ধ্যান করেন, তাঁহারাও মূর্ত্তি বা সাকার উপাসক; তবে কি পৌত্তলিক শব্দে দোষ না কি? হিন্দু মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা বা ধ্যান করেন সত্য, কিন্তু পুতুল পূজা করেন না। সেই অবিনাশী অক্ষয়-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আনন্দময় পুরুষেরই পূজা করিয়া থাকেন; তবে কোথাও বিধি পূর্ব্বক এবং কোথাও বা অবিধি পূর্ব্বক পূজা বা উপাসনা হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। পুরুষ স্বয়ং নিস্ক্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মশক্তি—প্রকৃতি ক্রিয়াশালিনী; এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা; গুণভেদে সৃষ্টি, পালন ও লয়কর্ত্রী। আদ্যাশক্তিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি; মহামায়ারূপে পালনকর্ত্রী ও জগদ্ধাত্রী; আর করাল বদনা কালী বা চামুণ্ডারূপে সংহার-কর্ত্রী। স্থাবর, জঙ্গম, উদ্ভিদ ও জীবরূপে মায়ের ত্রিবিধা মূর্ত্তি। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত নিস্ক্রিয় হইলেও তিনিই এই মহাশক্তির আশ্রয়স্থল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য বুঝিবার জন্য ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, হর ও গৌরী সংযোগ সর্ব্বত্র শুনিতে পাইবেন। যেমন বৈদ্যুতিক প্রবাহে পজিটীভ্ ও নেগেটিভ্ Positive & Negative current দরকার; তদ্রূপ যিনি ব্রহ্ম শিব বা মহেশ্বর, তিনিই পুরুষ এবং যিনি মহামায়া আদ্যাশক্তি, তিনিই মূল প্রকৃতি। এই উভয়ই এক অর্দ্ধনারীশ্বর অভিন্ন ও ভিন্ন; শিব ঈশ্বর, আর গৌরী মায়া। গৌরী মহত্তত্ত্ব, আর মহেশ্বর দ্রষ্টা।

এই জ্ঞানজ বিশ্বাস হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়; যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ভক্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়: ভক্তির গাঢ়তা, ভক্তির চরমাবস্থা, ভক্তির পুর্ণমাত্রা, ভক্তির পরাকাষ্ঠারই শেষ ফল—প্রেম; ভক্তি হইতে প্রেমের উৎপত্তি; কিন্তু যখন প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, প্রেমের স্রোতে হৃদয় ভাসিয়া যায়, হৃদয় যখন প্রেমরূপে পরিণত হইয়া যায়,; তখন আর ভক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় না; তখন আর ভক্তকে ভক্ত বলিয়া বুঝা যায় না। কেবল প্রেমের স্রোতই তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়; তখন তিনি প্রেমময় হইয়া সর্ব্বভূতে নিজেকে ও নিজ আত্মায় সর্ব্বভূত দেখিতে থাকেন। ভক্ত উপাদেয় খাদ্য পাইলে তাহা ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ পান; আর প্রেমিক উপাদেয় খাইতে খাইতে যাহা মধুর বোধ করেন, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তখন তাঁহাতে ও ঈশ্বরে পৃথকভাব থাকে না। এই প্রেম, এই ঈশ্বরে প্রেম প্রাপ্তির স্থান রাধা, রাধাই ঈশ্বর প্রেমের আধার; রাধা প্রেমে গঠিত, প্রেমের সমষ্টি, অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেমের অন্য একটি নাম রাধা; যেমন জ্ঞানের জন্য মহাদেবের, শক্তির জন্য প্রকৃতির উপাসনা করিতে হয়, তেমনি ঈশ্বরে প্রেম পাইবার জন্য রাধার উপাসনা করিতে হয়, জ্ঞান আরম্ভ হইলে যেমন জ্ঞানময় মহাদেবে শ্রদ্ধা আসে, জ্ঞান বৃদ্ধিতে যেমন ভক্তির উদয় হয়; তেমনি ভক্তির গাঢ়তাতে প্রেমের সঞ্চার হইলেই রাধার উপাসনার জ্ঞান আসে; তাই ভক্তগণ এত রাধা রাধা করেন। ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, আমার প্রেমের মহাজন রাধা। জল পাইবার স্থান যেমন সমুদ্র,

ঈশ্বরে প্রেম পাইবার স্থান তেমনি রাধা; জলাশয়ের নাম যেমন সমুদ্র, তেমনি প্রেমময়ী রাধা অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেমের সমষ্টির অন্য নাম রাধা।

যতদিন ভক্তি দৃঢ় না হইবে, ততদিন ঈশ্বরে প্রেম আসিবে না; রাধায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, রতি আসিবে না; প্রেমের কথা শুনিলে হাসি আসিবে।

অতএব জানি না, কেন শাক্ত ও বৈষ্ণবে দ্বেষভাব থাকে। শাক্তও বৈষ্ণব; আর বৈষ্ণবও শাক্ত। শক্তিপ্রার্থী শক্তির উপাসক—শাক্ত, আর সত্ত্বগুণময় পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসক — বৈষ্ণব।

উক্ত প্রকৃতি শক্তিই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি, সকলের নিয়ন্ত্রী; আদ্যাশক্তি, জগন্মাতা; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন; আব্রহ্ম সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব প্রসবিতার নাম সবিতা, সবিতাকে যিনি প্রসব করেন, তিনি সাবিত্রী; তিনিই গায়ত্রী, তিনিই আদ্যাশক্তি মূলপ্রকৃতি, ইনিই অনাদি। সৃষ্টিকর্ত্তাও এই শক্তির অধীন, এই প্রকৃতির সাহায্য ভিন্ন তিনি নিষ্ক্রিয়, সুতরাং আব্রহ্ম কীট সকলেই শাক্ত; আর সকলেই পরমাত্মার উপাসক বৈষ্ণব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই গায়ত্রীর উপাসনায় অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া জ্ঞানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিজাত গুণত্রয় হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; সুতরাং ইনিই মহামায়া মহাশক্তি, বিশ্বজননী, জগন্মাতা ও ইনিই মহত্তত্ত্ব। তাই শরীরকে গায়ত্রী বলা যায়। শরীর-রূপ গায়ত্রী অতিক্রম করিয়া প্রাণ

থাকিতে পারে না। শিশুর মাতৃত্যাগের ন্যায় জীবের গায়ত্রী ত্যাগ অসম্ভব।

এই গায়ত্রী হইতে সমস্ত মন্ত্রের উৎপত্তি; গায়ত্রী জপ করিলে সকল পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। মনু এই গায়ত্রী জপ দ্বারা সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে পাপের গুরুত্বানুসারে জপের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। শেষে বলিয়াছেন যে,—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূত পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥

মনু।

যিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা, অর্থাৎ তিনবার সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং॥ মনু।

প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলে অজ্ঞানকৃত নিশাপাপ সমুদয় ক্ষয় হয়, এবং আসনে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনাতে দিবসের অজ্ঞানকৃত পাপ সকল নষ্ট হইয়া থাকে।

এই গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায়; যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা কিছু বলা হইয়াছে; এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিই ব্রহ্মজ্ঞান, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যে জ্ঞান

থাকে, তাহা এই ব্রহ্মজ্ঞান; অন্য জ্ঞান থাকে না; ইহাকে পাতঞ্জল দর্শনে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা কহে। ঋত অর্থাৎ সত্য, প্রজ্ঞা—জ্ঞান, এই আলো হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে আত্ম ও অনাত্ম জ্ঞান জন্মে; তখন দুঃখের লেশমাত্র থাকে না; ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলে সাধকের অবস্থানুসারে সালোক্য, সমীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি হয়।

১। সালোক্য—ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস।

২। সামীপ্য—ঈশ্বরের সমীপে বাস।

৩। সাযুজ্য—ঈশ্বরের সহিত অভেদ।

৪। সারূপ—ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া।

পরে ক্রমে ক্রমে ধ্যান প্রবাহ দ্বারা সংস্কার সকল নষ্ট হইয়া সমাধি জ্ঞান মাত্র থাকে, ক্রমে সমাধি জ্ঞানও নষ্ট হইয়া কিছুকাল সেই ধ্যানের সংস্কার অর্থাৎ ছায়া মাত্র থাকে, যখন চিত্ত এইরূপ বৃত্তিশূন্য হইয়া কেবল থাকে মাত্র; তখন আর চিত্তের কোন ক্রিয়াই থাকে না, চিত্তের চেষ্টার শেষ হয়, অবসান হয়, চিত্ত নিরোধ হয়, পরে চিত্ত যে বীজ অবলম্বনে বর্ত্তমান ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া নির্বীজ হয়; এই অবস্থায় চিত্ত প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, তৎক্ষণাৎ মূল প্রকৃতি স্বতন্ত্রা হন, সুতরাং পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন; ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি কহে; ইহাই একেবারে শান্তি, নির্ব্বিবাদে শান্তি।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

ওঁ হরি ওঁ।

সমাপ্ত।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের

সম্বন্ধ নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য-১৲ এক টাকা।

এই পুস্তকখানি সাধারণতঃ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ (Relation) অর্থাৎ কোন্ ঔষধটি কোন্ ঔষধের কার্য্যাবশেষ পূরক (Complementary), কোন্ ঔষধের পর কোন্‌টি ব্যবহার দূষনীয় নহে, (Follow-well) ও কোন্ ঔষধটি কাহার বিষদোষনাশক (Antidote) এবং প্রচলিত যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কোন্‌টির ক্রিয়া কতক্ষণ স্থায়ী (Duration) ইত্যাদি চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অতি সরলভাবে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডখানি তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রথম অংশে—প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি প্রভৃতি দিবসের পৃথক পৃথক সময়ানুসারে প্রত্যেক ঔষধের কার্য্যকারিতা। (পরিমাণ-জ্ঞাপক চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া) দ্বিতীয় অংশে—স্পর্শন সঞ্চালন, বিশ্রাম, উপবেশন, শয়ন, বহির্বায়ু সেবন, উত্তাপ বা শৈত্যভোগ প্রভৃতি বাহ্যিক অবস্থানুসারে ঔষধের ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি (Amelioration and Aggravation) এবং তৃতীয় অংশে, ঔষধাবলীর দ্বারা উৎপন্ন মানসিক প্রফুল্লতা, পরিবর্তনশীল-প্রকৃতি, কাল্পনিক রুগ্নাবস্থা, অস্থিরতা, ঔদাসিন্য, অবিশ্বাস, ভয়,

উদ্যম-রাহিত্য, ক্রন্দনশীলতা, রাগ, মত্ততা প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক অবস্থা সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর ডাক্তার, হেরিং, গারেন্সি, কেন্ট এবং অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথ্ সি, জন্, বেনিং হোসেন্ কৃত সর্ব্বজন প্রশংসিত Relation-ship of Romedy পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, সুতরাং ইহার আর অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে ও পরিষ্কার নূতন অক্ষরে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে, এবং জর্ম্মান ফটো হইতে উদ্ধৃত মহাত্মা হানিমানের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতিও দেওয়া হইয়াছে।

"সমঃ সমং সময়তি" (Similia-Similibus-Curantur) চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই মূলতত্ত্বের উপর, এই চিরসত্য মহাবাক্যের উপর যে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত, তদনুসারে চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অকৃতকার্য্য বা আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত না হইবার কোন কারণই নাই। সত্য বিষয় গণিতের সূত্রের ন্যায় সকল অবস্থাতেই অভ্রান্ত। প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাপ্রণালীতেই যে কোন স্থলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উক্ত মূল সূত্রানুযায়ী ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে, কেবল তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, অন্যথা রাশি রাশি অনির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগেও মূল রোগের কোন উপশম হয় না, কাজেই রোগ বৃদ্ধি ও অপব্যবহৃত ঔষধের বিষক্রিয়াজনিত বিপদজনক নূতন নূতন দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট হয়। এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট অযথা ঔষধ প্রয়োগে সামান্য পীড়াগ্রস্থ রোগীও চিকিৎসিত হইলে চিরদিনের মত তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ

হইয়া যায়। "রোগ আরোগ্য ঔষধের গুণ সাপেক্ষ," তবে যে সদৃশমতে নির্ব্বাচিত প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগেও চিকিৎসক কোন কোন সময়ে প্রথমে বিশেষ উপকার পাইয়াও অবশেষে আশানুরূপ ফল পান না, অথবা প্রথম হইতে ফললাভে বঞ্চিত হইয়া এই "অমৃত পথ প্রদর্শনী" চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ হন, তাহা কেবল ঔষধের পরস্পর সম্বন্ধ, দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহাদের উপযোগিতা, মানসিক লক্ষণে ঔষধাবলীর আময়িক প্রয়োগ, এই সকল সম্যক বিদিত না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। হয় ত প্রথমেই ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিলেন, রোগও উপশম হইল, তৎপরে কার্য্যাবশেষ পূরক বা সমশ্রেণীর ঔষধ প্রয়োগের পরিবর্ত্তে বিপরীত সম্বন্ধের বা বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া, হয় একেবারেই রোগ আরাম হইতে দিলেন না, কিম্বা দুরারোগ্য করিয়া বসিলেন। এমনও হয় যে, ঔষধ প্রয়োগ ঠিক হইল, কিন্তু যেটি প্রাতেঃ প্রয়োগ ফলপ্রদ, সেটি সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আরোগ্যের আশাও অন্তর্হিত হইল। পীড়ামাত্রেই মনকে আক্রমণ করে, এবং মন অপ্রকৃতস্থ হইলেই শরীর বিকৃত হইয়া লক্ষণসমূহ শরীরে প্রকাশিত হয়, সুতরাং যদি রোগীর মানসিক ও শারীরিক লক্ষণাবলী মিলাইয়া সময় ও অবস্থানুসারে পীড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে পীড়া মাত্রেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে।

এই উপাদেয় গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে এক কথায় এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, এরূপ একখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়া

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সদৃশ বিধানমতে অতি কঠিন ব্যাপার যে, ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগরূপ তাহাও, যারপরনাই সহজসাধ্য ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইবে; এবং সাধারণ দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার ত কথাই নাই, অম্লশূল, ওলাউঠা, যক্ষ্মা প্রভৃতি যে সমস্ত সাংঘাতিক পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহাও সত্বর আরোগ্যে কৃতকার্য্য হইয়া সামান্য হাতুড়ে হইতে শিক্ষিত বহুদর্শী চিকিৎসক পর্য্যন্ত বিস্মিত ও বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত মোহরাঙ্কিত আছে।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে—

টাইফয়েড্-ফিবার-চিকিৎসা ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ~~৮০ বার~~ আনা। টাইফয়েড্-ফিবার-চিকিৎসা নাম হইলেও বিকার রোগমাত্রেরই চিকিৎসা উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ই, বি, ন্যাস কৃত দেশবিখ্যাত অত্যুৎকৃষ্ট Leaders is Typhoid নামক গ্রন্থের উৎকৃষ্ট ও সরল অনুবাদ, ইহাই যথেষ্ট পরিচয়।

৩। হোমিওপ্যাথিক মতে—

বৃহৎ-নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ রিপার্টারি সমেত, মূল্য ২॥॰ আড়াই টাকা। ৫৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। নিউমোনিয়া নাম হইলেও ইহাতে সমস্ত বক্ষঃ-রোগের উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিত চিকিৎসা লেখা হইয়াছে। ইহা পাঠে বক্ষঃরোগী মাত্রকেই যমের মুখ হইতে কাড়িয়া আনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিবে। এরূপ

উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই; যিনি এই পুস্তকখানি লইবেন, তিনি "প্লেগ-চিকিৎসা রিপার্টারি" সমেত, বিনামূল্যে অর্থাৎ উপহার পাইবেন।

৪। হোমিওপ্যাথিক মতে—

প্লেগ-চিকিৎসা রিপার্টারি সমেত ১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

৫। হোমিওপ্যাথিক মতে—

ওলাউঠা-বিজয় রিপার্টারি সমেত (যন্ত্রস্থ), মূল্য ১৲ এক টাকা। নাম লিখিয়া অগ্রিম গ্রাহক হইলে ॥০ আট আনায় পাইবেন।

৬। হোমিওপ্যাথিক মতে—

সংক্ষিপ্ত-ভৈষজ্য-রত্ন রিপার্টারি সমেত সম্পূর্ণ মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পূর্ব্বে ইহারই সামান্য অংশ সবল-হোমিওপ্যাথি নামক মাসিক পত্রিকাতে মাননীয় কিং এণ্ড কোং বাহির করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্যারাক্টারিষ্টিক্ লক্ষণ সকল এমনভাবে লেখা হইয়াছে, যে পাঠক একবার পড়িয়া মেটেরিয়া-মেডিকাতে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে ও প্রত্যেক ঔষধগুলিকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিবেন।

হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসা-বিজ্ঞান ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ আট আনা।

৭। হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাসোপান, মূল্য /৹ এক আনা।

৮। স্ত্রীর প্রতি উপদেশ বা তখনি তুমি দেবী, মূল্য ৶৹ দুই আনা। স্ত্রীকে যদি দেবী করিতে চাহেন, তবে দেবী পড়িতে দিউন।

ভগবান ৺ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত—

৯। আত্মানাত্ম বিবেকঃ মূল ও বঙ্গানুবাদ, মূল্য ।৹ চারি আনা। ইহা পাঠে নিতান্ত অজ্ঞানীরও আত্ম ও অনাত্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়, এবং অপার আনন্দ লাভ হয়।

১০। ধর্ম্মের তিনটি পথ। মূল্য ৶৹ দুই আনা।

তিনটি পথ পাঠ করিলে প্রকৃত পথ পাওয়া যায়। আজকাল অনেকেই ধর্ম্মপুস্তক মধ্যে গুপ্তবিষয় সকলের ভাবার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন; বুঝিতে না পারিলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এই অভাব পুরণই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ভারতে নূতন না হইলেও অনেকে ইহার নূতনত্ব অনুভব করিয়া আনন্দ হইবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ অশেষ গুণালঙ্কৃত রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর সদাশয় মহাশয় দয়া করিয়া মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার বহন করায় মূল্য ৶৹ দুই আনাই রহিল।

১১। মোহ-মুদগর, মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা।

ইহা প্রকৃতই মোহ-মুদগর। ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত অজ্ঞানীরও হৃদয় একবারও আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়।

১২। বাণযুদ্ধ, মূল ও বঙ্গানুবাদ, মূল্য ৵৹ দুই আনা।

ইহা পাঠ বা শ্রবণে জ্বর রোগ আরোগ্য হয়। ইহা রোগীগণের যেমন প্রাণদাতা, যোগীগণের যোগশিক্ষাবিষয়ে তেমনি সমাধিদাতা। সামান্য সামান্য জ্বর এবং পুরাতন জ্বর ইহা শ্রবণে আরোগ্য হইয়া যায়। সামান্য জ্বরে যাঁহারা বহু অর্থ ব্যয়ে ঔষধনামধারী নানা প্রকার বিষপানে দেহকে পুরাতন রোগের আকর করিয়া ফেলিযাছেন, তাঁহারা ৩ দিন বা ৭ দিন ইহার মূল পাঠ বা শ্রবণ করিয়া দেখুন।

বিশেষ সুবিধা।

যিনি বৃহৎ-নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ ক্রয় করিবেন, তিনি প্লেগ-চিকিৎসা" বিনামূল্যে উপহার পা

যিনি আত্মানাত্ম বিবেকঃ ও স্ত্রীর প্রতি উপদেশ একত্রে লইবেন, তিনি "মোহ-মুদ্গর" উপহার পাইবেন।

আর যিনি সমস্ত পুস্তকগুলি লইবেন, তিনি "প্লেগ-চিকিৎসা" "মোহ-মুদ্গর" ও "বাণ-যুদ্ধ" উপহার পাইবেন।

তিনটি পথ মূল্য ৵৹ দুই আনা। ইহার মূল্য যথাসাধ্য অল্প করা হইয়াছে; আবার নয়খানি লইলে ১৲ এক টাকায় পাইবেন।

এই সকল ঠিকানায়ও পুস্তক পাইবেন।—

ইকনমিক্ ফার্ম্মেসি—৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কিং এণ্ড কোং—৮৩ হ্যারিশন রোড।

এস, সি, আঢ্য কোং—৫৮ নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট।

বটকৃষ্ণ পাল—১২ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেন।

রায়চৌধুরী এণ্ড কোং—১৩৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সি, রিঙ্গার এণ্ড কোং—৪ নং ডাল হৌসিস্ স্কোয়ার।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি—৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার—৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

লাহিড়ী এণ্ড কোং—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং—৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সমস্তই কলিকাতাস্থ।